জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বনানীর প্রেম

বনানীর প্রেম

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

বা স ন্তী
১৫৩ কর্নোআলিস স্ট্রীট : ক'লকাতা ৬

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৬৪

প্রকাশক
মদনমোহন সাধুখাঁ
১৫৩ কর্নোআলিস স্ট্রীট
কলকাতা ৬

মুদ্রক
সুবোধচন্দ্র মণ্ডল
কল্পনা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
৯ শিবনারায়ণ দাস লেন
কলকাতা ৬

প্রচ্ছদশিল্পী
লিম্ অ্যাডভার্টাইজিং

প্রুফ সংশোধক
রাধাকান্ত শী

দাম
দু টাকা

শ্রীবিমল কর

বন্ধুবরেষু

এই লেখকের :

সূর্যমুখী

বারো ঘর এক উঠোন

বন্ধুপত্নী

ট্যাক্সিওয়ালা

শালিক কি চড়ুই

মীরার দুপুর
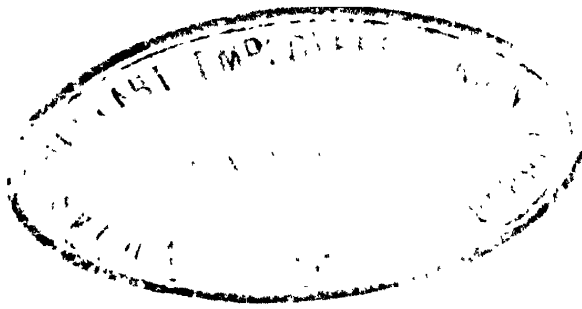
রজনীগন্ধা গানে	১
গানের ফুল	১৯
রিফ্রিজারেটার	২৯
সন্দেশ	৩৬
সূর্যমুখী	৪৫
ইস্ত্রি	৫৪
সোনার সিঁড়ি	৬৭
নিষ্ঠুর	৭৯
কমরেড	৯২
রিপোর্ট	১০১
আমার বন্ধু	১১০
বনানীর প্রেম	১১৬

রজনীগন্ধা গানে

বৈশাখের প্রচণ্ড উত্তপ্ত রৌদ্রঘন দুপুরে আমরা বেরিয়ে পড়তাম।

লিচু পাকতে শুরু করেছিল। কিন্তু পাকবার আগেই আমরা অর্ধেক সাবাড় ক'রে এনেছিলাম। আমরা তিনজন। তিনটি কুমারী। রেবা, ছন্দা ও আমি। কি আমরা ছাড়া তাঁর পেয়ারা, ডালিম ও আতা গাছের আড়ালে লুকানো লিচু গাছটায় সে বছর প্রথম ফলন হয়েছে—এ খবর পাড়ার ছোট বা বড় একটি ছেলেও জানত না। টেরই পায় নি। ছোট মেয়ে? তখন কম ছিল পাড়ায়। আমাদের চেয়ে বড় মেয়ের সংখ্যা মন্দ ছিল না। কিন্তু সব ক'টির তখন বিয়ে হয়ে গেছে। বিয়ে হয়ে গিয়ে ছেলেপুলে হয়েছে। মেয়ের সংখ্যাই বেশী ছিল। তখন একটু সকাল-সকাল মেয়েদের বিয়ে হত।

না, আজকের মত সেদিন বালিগঞ্জ প্লেস ঘিঞ্জি ছিল না। ছিল। জায়গায় জায়গায়। বাড়ির গায়ে বাড়ি, কি এ বাড়ির ব্যালকনি আড়াল ক'রে সে বাড়ির ছাদ যে মাঝে মাঝে চোখে না পড়ত, এমন নয়—কিন্তু খুব কম। একটু পরেই আবার ফাঁকা দেখা যেত। আম গাছ, জাম গাছ। দুটো-একটা পুকুর। পুকুরের চার পাড় দুর্বাঘাসে মোড়া। পাশ দিয়ে হয়তো ছোট্ট আঁকাবাঁকা পথ গেছে। পথের ওপর উপুড় হয়ে আছে কোমর-বাঁকা খেজুর কি বাবলা গাছ। আর চোরকাঁটা? উঃ, কি ভীষণ চোরকাঁটা ছিল তখন চারদিকটায়! এদিক-ওদিক একবারটি আমরা বাইরে পা বাড়িয়েছি কি, হাঁটু অবধি শাড়ি, এমন কি শায়াটিও, চোরকাঁটায় বোনা হয়ে যেত। ব্যাস, তারপর দু ঘণ্টা ঘাড় গুঁজে বসে থেকে সেসব বাছ! এমন ক'রে রোজ কাপড়ে চোরকাঁটা গেঁথে নিয়ে বাড়িতে কি আমরা কম বকুনি খেয়েছি! থাক সেসব কথা। আর দেখতুম, চোরকাঁটা-ভরতি মাঠের উপর বাঁশ পুঁতে দড়ি খাটিয়ে রাজীব কি নীলমণি ধোবা কাপড় শুকোতে দিয়েছে। পাড়ায় যে ছোট মেয়ে তখন কম ছিল, রাজু বা নীলুর দড়ি দেখেই তা বোঝা যেত। ফ্রক একরকম চোখেই পড়ত না। মাঠের দড়ির গায়ে হাওয়ায় উড়ুউড়ু করত শার্ট, পেণ্টলুন, গেঞ্জি, সালোয়ার আর শাড়ি-ব্লাউজ। প্রায় কি সপ্তাহে নীলুর দড়ি দেখে আমরা

বুঝতে পারতাম, পাড়ায় নতুন লোক কেউ এল কিনা বা পাড়া ছেড়ে কেউ চলে গেছে কিনা। এবং এ কথাও সত্য, তখন কালেভদ্রে মানুষ পাড়া ছেড়ে অন্যত্র গেছে বা নতুন মানুষ এসেছে আস্তানা গাড়তে। নতুন মুখ তখন চোখেই পড়ত না। মাঠের জামাকাপড় ও রুমালের সংখ্যা মোটামুটি আমাদের মুখস্থ ছিল। হ্যাঁ, অস্বীকার করব না। নতুন কোন পরিবার বালিগঞ্জ প্লেসে থাকতে এসেছে শুনলে আমাদের বুক কাঁপত। নতুন পরিবার মানেই, বুড়ো-বুড়িদের কথা ধরছি না, আর এক গুচ্ছের ছেলেমেয়ে। ছেলেতে আপত্তি ছিল না। ভয় ছিল মেয়ে। মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে শুনলে ভয়টা কাটত এবং যদি শুনতাম ফ্রক-পরা, তখন আরও নিশ্চিন্ত হতাম। হ্যাঁ, সেদিন বারো—বারো থেকে তেরোর মধ্যে বয়সের কাছাকাছি একটি মেয়েও ফ্রক পরত না। এবং আমাদেরও অত ছোটদের দিয়ে ভয় ছিল না।

এতটা বলার পর আমাদের এই দুশ্চিন্তার কারণ আপনাদের বলতে দ্বিধা করা উচিত না। আমাদের তিনটি কুমারীর ভীষণ ভয় ছিল, পাছে চতুর্থ কুমারী এসে আমাদের পাশে দাঁড়ায়। কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা, দাঁড়ায় নি। একনাগাড়ে তিনটি বছর আমরা বালিগঞ্জ প্লেসে রাজত্ব করেছিলাম।

হ্যাঁ, আমাদের নিয়ে পাড়ায় আলোচনার ঝড় বইছিল, টের পাচ্ছিলাম। ছোট-বড়-বুড়োদের মুখে। বাড়ির গিন্নিদের মুখে—এমন কি, চাকর-দারোয়ানদের মুখেও—আমাদের রূপের বর্ণনা শেষ হচ্ছিল না।

তিনটি ফুল।

'রেবার চুলের মত এমন সুন্দর চুল বালিগঞ্জ প্লেসে এর আগে কোনও মেয়ের মাথায় আমরা দেখি নি!' সবাই বলত, 'ছন্দা কোথা থেকে এমন জ্যোৎস্না-ছাঁকা গায়ের রং নিয়ে এল!' আর আমার চোখ নাকি 'দুটো নীল অপরাজিতা। যা ঘন বর্ষায় ফোটে। চোখের পাতা অপরাজিতার দুটো পাপড়ি।'

শুনতাম, শুনে চুপ ক'রে থাকতাম।

না, তখনও—বিয়ে করলাম কি না-করলাম তোয়াক্কা রাখি না মেয়েদের মত বেপরোয়া আমরা হয়ে উঠি নি। ভব্য-সভ্য ছিলাম। আর, বিয়ে আমাদের হবে—এই প্রচণ্ড অনুভূতিই সারাক্ষণ আমাদের মন এবং শরীর পুলকিত ক'রে রাখত। আজ গোপন করব না কিছু।

আমাদের চারিদিকে প্রশংসার ঝড় বইছিল—এ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ছিলাম ব'লে ছেলেদের সামনে এখনকার মেয়েদের মত হুটহাট বেরিয়ে পড়তে

সংকোচ বোধ করতাম। বিকেলে বুড়োর দল চোরকাঁটা-ভরতি মাঠে লাঠি ঘুরিয়ে (তখনও নতুন পার্ক হয় নি) পায়চারি করত আর গল্প করত। তাদের গল্পের শেষ ছিল না। রাজনীতি, বাজারদর, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য এবং ছেলে-মেয়েদের পড়াশোনা, শেষ পর্যন্ত ছেলেদের চাকরি ও মেয়েদের বিয়েতে গিয়ে আলাপটা ঠেকত। তার পরেই রূপ। কার বাড়ির কোন মেয়েটি দেখতে ভালো। এবং বয়স্থা অর্থাৎ বিয়ের যুগ্যি ক'টি। কারা। তিনজন। রেবা, ছন্দা ও আমি। আমার চোখ, রেবার চুল, ছন্দার রং।

শ্রদ্ধেয়-নমস্যদের সামনে তাই অত রূপ নিয়ে রাস্তায় বেরতে বুকের ভিতর কাঁপত। সংকুচিত হয়ে দেখতাম।

তাই আমরা চুরি ক'রে বেড়াতে বেরিয়েছি।

দুপুরে। বাড়ির গিন্নিরা নাক ডাকিয়ে ঘুমোতেন। অফিসে যিনি যেতেন, তিনি তো যেতেনই চলে—যে বাড়ির কর্তাটি রিটায়ার্ড, তিনিও দুপুরে গড়িয়ে নিতেন। চাকরবাকরেরা ঘুমোত। ছেলেরা সব স্কুলে-কলেজে চলে যেত। তাই রাস্তা ফাঁকা পেয়ে আমরা তিন কুমারী বেরিয়ে পড়তাম। অবশ্য লেখাপড়া আমাদেরও ছিল। হ্যাঁ, আমার আর রেবার ম্যাট্রিকুলেশনের বছর সেবার, ছন্দার কলেজে ফার্স্ট ইআর। হালে যেমন কোন কোন স্কুল-কলেজে ছেলেদেরও মর্নিং ক্লাসের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, তখন সে নিয়ম ছিল না। তখন মর্নিং ক্লাসটা যেন মেয়েদের একচেটে ছিল। আমার যদ্দুর মনে আছে। অর্থাৎ দুপুরে কোনও কারণেই কোন বাড়ির ছোট বা বড় মেয়েকে বেরতে হত না। সে নিয়ম ভাল ছিল কি মন্দ ছিল, তার সমালোচনা করা বৃথা। আমি এখানে কেবল আমাদের গল্পটা বলছি। লিচু চুরির। বাড়ি থেকে চুপিচুপি বেরিয়ে চোরকাঁটা-ভরতি রোদালো ফাঁকা মাঠে নেমে রাজু-নীলুর দড়িতে টাঙানো শায়া-শাড়ি-ব্লাউজগুলি গুণতে গুণতে তিন সখী একটা খেজুর-বনের পাশ দিয়ে দুটো প'ড়ো ইঁটের ঢিপি পার হয়ে চলে যেতাম ডালিম-আতার ছায়া-ঢাকা মস্ত বড় বাগানে। এক কোণে ছোট্ট লিচু গাছ। ফাল্গুন মাসে নতুন পাতা গজিয়ে যৌবনবতী হয়েছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলো ফল। সত্যি, বেচারা লিচু গাছটা ওইটুকুন বয়সে আর ক'টাই বা ফল দিতে পারত! প্রথমবার। তাও লুকিয়ে লুকিয়ে। আমরা তিন কুমারী হঠাৎ ওকে আবিষ্কার ক'রে ফেলে যেন তাড়াতাড়ি ক'রে ওর উপর প্রতিশোধ নিতে লেগে গেলাম। সবুজ শক্ত খোসা ছাড়িয়ে ছাড়িয়ে ওর কচি বাচ্চা-গুলোকে আঁতুড়েই শেষ ক'রে আনলুম। পর-পর তিনটে দুপুর। তিনজন

গাছকোমর ক'রে কাপড় পরে রুদ্ধশ্বাসে লিচু পাড়তে লেগে যেতাম। ঢিল মেরে, পায়ের আঙুলের উপর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে, কখনও লম্বা হাত বাড়িয়ে, তাতেও সুবিধা না হলে একজনের ঘাড়ের উপর আর একজন পা রেখে লিচু পাড়তে চেষ্টা করতাম। চুল খুলে যেত, শাড়ি খসে পড়ত। হ্যাঁ, এত তাড়াহুড়া! শেষ পর্যন্ত অনেক ছিঁড়ে আনতুম। আমাদের ভয় ছিল সামারের ছুটি।

কেননা, স্কুল-কলেজ ছুটি হলে পাড়ার দস্যি ছেলের দল ছুটির পয়লা দুপুরেই ওকে আবিষ্কার ক'রে বিকেলের মধ্যে সব ক'টা ফল ও লালচে সবুজ বাহারের পাতাগুলোকেও শেষ ক'রে দেবে, সন্দেহ ছিল না—তাই আমাদের তাড়াহুড়া ও অতটা অশান্তি। আমরা চাইতুম না, ডালপালা ভেঙ্গে গাছটা সে বছরই শেষ হয়ে যাক। আসছে বছর বেঁচে থেকে লুকিয়ে ফল ফলিয়ে ও আমাদের আবার ডাকুক। আমরা চুরি ক'রে ওর কাছে চলে যাব।

সত্যি, রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠার মত সেই লিচুতলার বাগান। আজ অবধি বালিগঞ্জ প্লেসে এত বাড়ি উঠল, বাগান হল, তেমনটি চোখে পড়ছে না আর।

অবশ্য রোজ অতটা সময় ঘুরে বাগান দেখার সময় ও সাহস আমাদের ছিল না।

লিচুতলা ছেড়ে টুপ ক'রে বাগানের পূব অংশে চলে যেতাম। একটা ঘরের খোলা জানলা আমাদের তখন ভীষণ ডাকত।

পায়ের কাছে রাশিরাশি ভুঁইচাঁপা ছিল। সেগুলো দু পায়ে মাড়িয়ে জানলার নিচের ও তারের বেড়ার গায়ে লতানো ফুলন্ত মাধবী জঙ্গলটাকে জায়গায় জায়গায় চিরে ফেলে আমরা ঘরের ভিতর উঁকি দিয়ে দেখতাম।

লিচু খাওয়াটা উপলক্ষ—আপনারা, বুদ্ধিমান পাঠকরা, নিশ্চয় এতক্ষণে আন্দাজ ক'রে নিয়েছেন। বলছি, লুকোবার কিছুই নেই। সেই সুন্দর ঘরের ভিতর দুটো নতুন কুঁড়ি ও লাল টুকটুকে একটা কলি সমেত পিতলের টবের গোলাপ গাছটা ও উল্টোদিকের দেওয়ালের ব্র্যাকেটে ঝোলানো একটা সোলার টুপি আমাদের চোখে পড়ল। প্রথম দিন এটুকু দেখা।

তারপর দিন আঙুলের মাথার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে উঁকি দিয়ে সাজানো সুন্দর টেবিল, সুজনি-ঢাকা বিছানা, হাতলের উপর উপুড় ক'রে রাখা খোলা বই সমেত শূন্য ইজিচেয়ারটা দেখতে পেলাম।

তৃতীয় দিন এক-একজনের কাঁধের উপর পা রেখে দাঁড়িয়ে ভিতরটা আরও ভালো ক'রে দেখা গেল। দেখা শেষ ক'রে তিনজন চুপচাপ কতক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে ঘুঘুর ডাক, আতা ও ডালিম পাতার মৃদু সরসর শব্দ শুনলাম। ওধারে বারান্দায় দারোয়ান পেয়ারা গাছের ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগিয়ে নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছিল। গাছের একটা ডাল নুয়ে দারোয়ানের কপাল ছুঁইছুঁই করছিল। কাশীর পেয়ারা। ছড়ানো বড়-বড় পাতা দেখেই চিনতে পারলাম। ফুল ঝরে গিয়ে গুটি এসেছে। কিন্তু পেয়ারা আমাদের ডাকতে পারল না। গুটিগুলো বড় হবার আগেই আমাদের গল্প শেষ হয়ে গিয়েছিল।

বৈশাখের আগুন-ঢালা গন্‌গনে ক'টা দুপুরের ঘটনা। সামনে সামারের ছুটি আমাদের নাকের উপর খড়্গ হয়ে ঝুলছিল।

বালিগঞ্জ প্লেসের দস্যু ছেলের দল রাতারাতি সব ক'টা মাঠের চোরকাঁটা সাফ ক'রে দিয়ে মাথা-ভাঙ্গা রোদে ছুটে ক্রিকেট পিটবে, ফুটবল খেলবে, ডোবার জল ছেঁচে মাছ ধরবে, বাগানে বাগানে টহল দিয়ে পাখির বাসা ভাঙ্গবে, ঘুড়ি ওড়াবে, চড়ুইভাতি খাবে, আর আমাদের তিনজনের নিন্দা ক'রে বেড়াবে।

সেই লোমহর্ষক দিনগুলি আসার আগে আমরা বাইরে বেড়ানো ও দর্শনীয় জিনিসগুলি দেখে ফেলা ঠিক ক'রে ফেলেছিলাম।

তিন দুপুরে বাগানটাকে তিনজনের ঘরবাড়ি ক'রে ফেললাম। দারোয়ানের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। আর ঘাড়ে-কাঁধে উঠে নয়, সরাসরি বারান্দা পার হয়ে দরজার তালা খুলে ভিতরে ঢুকে ঘুরে ঘুরে জিনিসপত্র দেখতে লাগলাম।

তামাক খাবার পাইপ, বই, দাড়ি কামানোর সরঞ্জাম, জুতো, লুঙ্গি, গামছা, ছেড়ে-রাখা টাই, পাতলুন, রুমাল, ময়লা গেঞ্জি। আর একটু ভিতরের দিকে দেখলাম খাবার টেবিল। বাটি-গ্লাস-প্লেট ক'টি আলমারিতে সাজানো, মাজাঘসা, ঝকঝকে।

স্নানের জায়গা। সাদা কলাই-করা টব, ডালা-খোলা সোপ-কেস, সাবানের মজে-যাওয়া ফেনার দাগ। সব দেখতে দেখতে তারে ছড়িয়ে-দেওয়া শুকিয়ে-আসা টার্কিশ টাওএলটা—হ্যাঁ, বলব—লজ্জার মাথা খেয়ে ছন্দা দুবার গালে ঘসল, গন্ধ শুঁকল। আমি ভদ্রলোকের চিরুনিটা দিয়ে মাথার চুল ঠিক করলাম। আর, রেবা আমাদের চেয়ে এক বছরের ছোট—তাই বেশী ছেলেমানুষি ক'রে শূন্য বিছানার উপর দুবার গড়াগড়ি দিয়ে উঠল। নিঃশব্দে। অত্যন্ত তাড়াতাড়ি। ওর কাণ্ড দেখে আমরা দুজন খিলখিল ক'রে হাসলাম।

অবশ্য একটু বাদে চৌকাঠের কাছে দারোয়ানের পায়ের শব্দ হতে তিনজনে ব্যস্ত হয়ে আবার দরজায় ছুটে এলাম। দারোয়ানের হাতে চাবির গোছা

ও তিনটে আধুলি ছেড়ে দিয়ে রোদ না ফুরোতে যে যার বাড়ি ফিরে এসেছি। কেননা, বিকেল পড়তে বুড়োরা ছড়ি হাতে বেরিয়ে পড়বেন—দুশ্চিন্তা ছিল।

হ্যাঁ, পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাইকে আমাদের ভয় ছিল।

আর একটু পরিষ্কার ক'রে না বললে চলছে না, শুনুন। বড় সরকারী চাকুরে সুকোমল রায়। কর্মস্থল দার্জিলিং। ছুটি নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। ডালিম, আতা, পেয়ারা ও লিচু বাগান সমেত বালিগঞ্জ প্লেসের প্রকাণ্ড বাড়িটা তাঁর পিতৃদত্ত। বাবা-মা কিছুকাল আগে স্বর্গীয় হয়েছেন। সুকোমলবাবুর ভাইবোন কেউ ছিল না। তাঁর অনুপস্থিতিতে বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়ি দারোয়ানের জিম্মায় থাকত। ফি বছর পুজোর ছুটিতে কলকাতায় এসে তিনি দু-তিন সপ্তাহ কাটিয়ে আবার দার্জিলিঙে ফিরে যেতেন। সপরিবারে এসেছেন, সপরিবারে ফিরে গেছেন। আগে ততটা খোঁজখবর আমরা রাখি নি, তাঁর ছেলেমেয়ে ক'টি। রাখবার দরকার ছিল না। চল্লিশের কাছাকাছি বয়স ভদ্রলোকের। শুনতাম আমরা। কোনদিন হয়তো তাঁকে দেখিও নি। যদি দেখেও থাকি, হয়তো ভালো ক'রে তাকাই নি। তাকাবার প্রয়োজন বা উৎসাহ আমাদের মত বয়সের মেয়েদের যে ছিল না, এটা আন্দাজ করতে পারছেন। কেননা, পাড়ায় তাঁর বয়সের বিদ্বান বড়লোক, বাড়ি-গাড়ির মালিক আরও পুরুষ ছিল। একটার জায়গায় দুখানা বাড়ি, একটা গাড়ির বদলে দুটো গাড়ির মালিক, বড় চাকরি করে কিংবা ব্যবসা-বাণিজ্য ফেঁদে বসে বিষয়সম্পত্তির পরিমাণ ক্রমশ স্ফীততর করছেন, এমন লোকও ছিল। যাক সেসব। এখন আমাদের সব উৎসাহ, একসঙ্গে তিনটি কুমারীর ধ্যানধারণা-কৌতূহল হঠাৎ সুকোমলবাবুর উপর কেন্দ্রীভূত হল কেন, কারণ না জানা পর্যন্ত নিশ্চয়ই আপনারা অস্বস্তি বোধ করছেন। তাঁর বাগানের লিচু-ডালিম ছাড়া আরও কিছু আমাদের টানতে শুরু করেছিল।

হ্যাঁ, বিপত্নীক।

খুব সম্প্রতি তাঁর স্ত্রীবিয়োগ ঘটেছে। এবং তাঁদের সন্তান—দেড় বছরের একটিমাত্র মেয়ে—মার মৃত্যুর তিন দিন পরে আর একটা অসুখে ভুগে মারা গেল। সাঁইসাঁই ক'রে খবরটা আমাদের কানে এসে পৌছল।

পর-পর দুটি শোকাবহ ঘটনার পরে আজ দেড় মাস তিনি ছুটি নিয়ে কলকাতায় আছেন।

কি? কেন?

হ্যাঁ, তিনি আবার এখুনি বিয়ে করতে চাইছেন। উপযুক্ত মেয়ে পেলে কালই করেন।

কে আমাদের এ কথা বলল ?

তাঁর বাগান বলল, তাঁর গাছের পাতারা বলল ; ঘরের গন্ধ, বিছানার রং দেখেই সেদিন তিন কুমারী টের পেলাম, প্রথমা স্ত্রীর লোকান্তরের পর দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে সচরাচর পুরুষ যতটা কালক্ষেপণ করেন, তার সিকিভাগও তিনি করতে রাজি না।

হ্যাঁ, স্ত্রীকে তিনি ভালবাসতেন। আবার এদিকেও তিনি অতিমাত্রায় ভোগী।

আমরা কি ক'রে পরিচয় পেয়েছিলাম, আমরা কি ক'রে ভদ্রলোকের এতটা ভিতরের খবর জেনে ফেলেছিলাম, শুনতে আপনাদের কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক। কেননা, সুকোমলবাবু যে সেবার দার্জিলিং থেকে এসেই সে কথা পাড়ায় রাষ্ট্র করেছিলেন, আমাদের অভিভাবক না হ'ক পড়শি কোনও বয়োজ্যেষ্ঠের কানে কথাটা তুলেছিলেন, তা না।

একটা কথা বলে রাখছি। বয়স কম, বড় চাকুরে, উপরে-নিচে পুষ্যি নেই এবং বড়লোক। তাঁর পত্নীবিয়োগ ঘটার পরে পাড়ার ছেলেবুড়ো সবাই সজাগ হয়ে উঠেছিল।

এবং সেই চিন্তা তাঁদের আমাদের তিনজনকে নিয়েই হয়েছিল। বেশ বুঝতাম। এটা বালিগঞ্জ প্লেসের হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছিল, আমরা টের পেলাম।

কেননা, বিয়ের বয়সের বলতে তিনজন ছাড়া পাড়ার অন্য মেয়ে নেই, আপনারা জেনে গেছেন।

বলতে কি, অমুক ছেলে ভালো গাইতে পারে, অমুক সাহিত্যিক, আর একজন সাঁতারু, নয়তো ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান ক্লাবের নামজাদা খেলোয়াড়— পাড়ায় সেসব ছেলের অভাব ছিল না।

কিন্তু আমরা যে জাত-গিন্নি হয়ে তিনজন জন্মেছিলাম! আর একটু পরিষ্কার ক'রে বলছি।

এত ভালো ভালো ছেলে—এমন কি, জলপানি-পাওয়া আই সি এস হয়ে-আসা সোনার টুকরো কোনও কুমারও—আমাদের টানতে পারে নি।

আমাদের লক্ষ্য ছিল সাজানো ঘর, সাজানো বাগান, তৈরী মানুষ। সংসারাভিজ্ঞ পুরুষ আমাদের বেশী টেনেছিল—কেননা, তখন যুগটাই ছিল লক্ষ্মীর। এখনকার মত উড়নচণ্ডী রেস্টুরেন্ট-সিনেমা-বিলাসিনী মেয়েদের

মত লাভার নিয়ে ফুটপাথে ঘোরার বিলাসিতা করার কুৎসিত প্রশ্রয় বাপ-মা আমাদের দেয় নি।

শুনুন তারপর।

হ্যাঁ, তাঁর ফলফুলভরা বাগান, মূল্যবান আসবাবপত্র, দামী জিনিসে ভরা ঘরের মধুর আত্মীয়তাবোধে আমরা প্রায় আচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিলাম। দুপুরে। সেই সেদিনের জনবিরল বালিগঞ্জ প্লেসের নিঃশব্দ একটা প্রহরে। সেবার হঠাৎ।

তিন দিনের মাথায় লজ্জার মাথা খেয়ে মুখপুড়ি রেবা হিন্দুস্থানী দারোয়ান সুখনলালকে প্রশ্ন ক'রে বসল, 'তোমার বাবু কি একবারে শাদি ক'রে তারপর দার্জিলিং ফিরে যাবে ?'

সুখনলাল তিনটি যুবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে মিটিমিটি হাসল।

'তোমার বাবু রোজ দুপুরমে কোথায় বেরিয়ে যান ?' আমি প্রশ্ন করলাম।

ছন্দা বলল, 'তোমার বাবুর খানাপিনা এখানে পাকায় কে ?'

এখনকার হাড়ে-পাকা মেয়েদের মত তখন কিন্তু আমরা অত তড়বড় ক'রে হিন্দী বলতে পারতাম না।

মুখটা নিচের দিকে রেখে অল্প-অল্প হেসে সুখনলাল খৈনি ডলে। যখন চোখ তোলে, আমাদের দিকে তাকায়, বেশ বুদ্ধিমানের মত হাসে।

পরে আমাদের চেয়েও সে পরিষ্কার বাংলায় হড়হড় ক'রে যা বলল, তাতে জানা গেল, তিনি বিয়ে ক'রেই কর্মস্থলে ফিরে যাবেন—সেরকম মতলব। আর দিন দশেক ছুটির বাকি আছে। মুখচোরা মানুষ। এ পাড়ায় সাহস ক'রে মুখ ফুটে কাউকে আবার বিয়ে করার কথা বলতেই পারছেন না। দুপুরে চলে যান সোজা অফিস-পাড়ায়। সেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব আছে। তারা নাকি তাঁকে মেয়ের খোঁজ দেবে।

'খাওয়া-দাওয়া ?' রুদ্ধস্বরে রেবা প্রশ্ন করল।

'তা আর এখানে কে ক'রে দেয়! মাছ-মাংস আমি রান্না করি না। হনুমানজির বংশ। বাবু বাইরে হোটেলেই খানা সারেন।'

যেন আমাদের তিনজনের বুকের মধ্যে খচ্ খচ্ ক'রে উঠল।

'ইস্, কত টাকা নষ্ট হয়! আর—'

ছন্দার অসমাপ্ত কথা শেষ ক'রে আমি বললাম, 'হোটেলে খেয়ে কি শরীর টেঁকে ?'

'দু বেলাই হোটেলে খান নাকি রে?' রেবা আবার প্রশ্ন করল।

সুখনলাল ঘাড় নাড়ল।

অদূরে বাগানের চাঁপা গাছে একটা কাঠঠোকরা ঠক্‌ঠক্‌ ক'রে উঠল। পেয়ারাতলায় একটা কাঠবিড়ালী উপর থেকে সড়াত ক'রে নেমে এল।

দারোয়ান সুখনলাল দু চোখ ভরে আমাদের তিন কুমারীর রূপ দেখছিল, আর বড় বড় ঢোঁক গিলছিল। লক্ষ করলাম।

সুখনলালের মুখের দিকে না তাকিয়ে আমরা তিনজন পরস্পরের চোখের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'না, নিজের স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য থাকা-খাওয়ার শান্তি, তৃপ্তির জন্য লজ্জা করলে চলে কখন? লাজুক মানুষেরা সংসারে কষ্টই পায়।'

ভেবেছিলাম, আমাদের তিনজনের সঙ্গে সুখনলাল হেসে উঠবে। দেখলাম, ঘাড় হেঁট ক'রে সে পূর্ববৎ খৈনি ডলছে। গৌরবর্ণ পুরুষ। দু কান লাল হয়ে গেছে। সুখনলাল যুবক—এতক্ষণে আমাদের চোখে পড়ল।

'আমরা যে তিনজনই এ পাড়ার মেয়ে তোর বাবুর বাগানে রোজ এসে অত্যাচার করছি, তাতে কি তোরা মনে মনে বিরক্ত হ'স, সুখন?'

নিমের ডাল দিয়ে দু বেলা ঘসা সাদা শক্ত দাঁতের সারি বার ক'রে সুখন হাসল ও মাথা নাড়ল।

না, দিদিমণিদের উপর সে একটুও বিরক্ত না। এ পাড়ার মেয়ে। তিনজনের নাম, কার কত নম্বরের বাড়ি এবং কে কি পড়ে—সুখনলালের সব মুখস্থ। সন্ধ্যার পর বাবু বাড়ি ফিরলে তার ডিউটি শেষ হয়। তখন সে পাড়ায় ঘুরে ঘুরে দেখে এবং সকলের সঙ্গে কথা বলে।

সুখনলাল যে সকলের সঙ্গে ভালো আলাপ পরিচয় রাখে, তার প্রমাণ পাওয়া গেল সে আমার বাবার নাম, ছন্দার জেঠার নাম ও রেবার মামার নাম নির্ভুল বলে দিলে। রেবা ছোটবেলা থেকেই মামার বাড়িতে মানুষ।

সুখনের কথা শুনে আমাদের শরীর-মন জুড়িয়ে গেল। কেবল তিনটে আধুলি বকশিশ পাবার লোভে না, পাড়ার মেয়ে, তার মনিবের প্রতিবেশিনী ভালো ক'রে জেনেই সে তিনজনকে পরম আত্মীয়ের মত এ বাড়ির দরজার তালা খুলে ঘরের সব কিছু—উঠোন, বারান্দা, বাথরুম—দেখতে দিচ্ছে। টের পেয়ে তিনজন পুলকিত হয়ে উঠলাম।

যে কথা গরম সাঁড়াসি দিয়ে পুড়িয়ে দিলেও আমাদের দুজনের মুখ থেকে বেরত না, তা সড়াত ক'রে রেবার জিভ থেকে বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁ রে সুখন, তোর বাবু কি একদিনও টের পেলে না, আমরা আসছি, আমরা রোজ দুপুরে ডাইনির মত তার ঘর-দুয়ার-বাগান-বাথরুম সামলে রাখছি!'

কথা শেষ ক'রে ফস্ ক'রে কোমর থেকে হল্‌দে বড় রুমালটা টেনে বার ক'রে রেবা মুখে গুঁজল।

বোঝা গেল, আর এ ধরনের প্রশ্ন না ঠোঁটের আগায় আসে, তার চেষ্টা—এত বড় রুমালটা মুখের মধ্যে গুঁজে রেবা তাকাচ্ছে। চোখে জল এসে দাঁড়িয়েছে, কৌতুকে কুটিলতায় প্রখর কালো চোখ।

এই চোখের ভাষা সুখনলালের বুঝতে কষ্ট হল না। ভয়ে আমাদের বাকি দুজনের বুকের মধ্যে কাঁপছিল। আমার, ছন্দার।

'একটা কথা বলে রাখছি।'

মুখ থেকে রুমালটা বার ক'রে গম্ভীর হয়ে রেবা বলল, 'খবরদার, কখনও একজনের নাম করবি না—আমরা তিনজন আসি—এক নিশ্বাসে তিনজনের নাম ক'রে তবে তোর বাবুকে বলবি যে, ওরা আপনার বাগানের কাঁচা লিচু খেয়েছিল, কি চুরি ক'রে বাথরুমে ঢুকেছিল।'

'বহুত আচ্ছা!' বুদ্ধিমান সুখন পুনঃপুনঃ শির সঞ্চালন ক'রে বুঝিয়ে দিল—না, সেরকম ভয় নেই। অর্থাৎ পক্ষপাতিত্ব ক'রে সে বাবুর কানে অমুক নম্বরের বাড়ির দিদিমণির চোখ সুন্দর, কি আর এক দিদিমণির চুল সুন্দর—এসব সে কিছুই বলবে না।

'খবরদার, আমাদের বাড়ির নম্বর বলবি না।' রেবা দ্বিতীয়বার সাবধান ক'রে দিলে। বাঁ দিকে করমচা-ঝোপে একটা ফিঙ্গে নাচানাচি করছিল।

'বহুত আচ্ছা, বহুত আচ্ছা!' নতুন খৈনি টিপতে আরম্ভ করল সুখন মাথা গুঁজে। 'হাম সমঝ গিয়া।' এখন থেকেই এ বাড়িতে পক্ষপাতিত্ব দেখা দিলে আমাদের তিনজনের মধ্যে ঈর্ষা-হিংসার গরল বাসা বাঁধবে, চতুর সুখনলালের বুঝতে কষ্ট হল না।

বলতে কি, এদিকে রেবার ব্যবহারে রাগে, দুঃখে আমাদের দুজনের চোখে আগুন ঠিকরে বেরচ্ছিল।

সহস্রবার দাঁতে দাঁত ঘসে মুখপুড়ির মুণ্ড চর্বণ করলাম।

'বুঝলি না, তোর বাবু তো কাউকে এখনও দেখল না! আগেই যদি অমুক দিদিমণির চোখ ভালো কি নাক ভালো বলে মন-টন ভুলিয়ে দিস তো আর দুজনের দিকে তিনি বিবনয়নে তাকাবেন। আর, তোর কাছ

থেকে বাড়ির নম্বর জেনেশুনে সরাসরি সেখানে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলে মুশকিল হবে। একজন দশ দিনের মধ্যে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধে মজা ক'রে দার্জিলিঙের গাড়ি চাপবে, আর দুজন এই মাঠে পড়ে থেকে ধোবার দড়িতে শুকোতে-দেওয়া ইজার-হাফপ্যান্ট দেখবে চোখ উদাস ক'রে—এ কখনও কি হয় রে বোকা! আমরা তিন সখী কখনও ছাড়াছাড়ি হচ্ছি না, বুঝলি!'

বলে রেবা আর তার কৃত্রিম গাম্ভীর্য ধরে রাখল না। হাসির ফেনা মাথায় নিয়ে ওর খুশির ঢেউ আমাদের দিকে উদ্দাম বেগে ছুটে এল। আমরা ভেসে গেলাম। অর্থাৎ ওর সঙ্গে খুব খানিকটা হাসলাম।

হাসলাম আর মনে মনে একশ' বার রেবার বুদ্ধির তারিফ করলাম। অর্থাৎ দুপুরে চুরি ক'রে তিনজনের লিচু খেতে আসার পিছনে অন্য কোনরকম উদ্দেশ্য বা ইচ্ছা লুকিয়ে নেই, আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সুখনলালকে ও বোঝাতে পারল জেনে গর্বে আমাদেরও বুক ফুলে উঠল। আরও আট আনা ক'রে সেদিন সুখনকে বকশিশ দিলাম।

না, সেরকম কিছু ভয় নেই—ভালো ছেলে সুখন তিনবার মাথা নেড়ে আমাদের অভয় দিলে। সে কোন কথাই আপাতত তার মনিবের কানে তুলবে না। যত ইচ্ছা, যত খুশি দিদিমণিরা বাগানের কাঁচা 'লিচ্চি' খেয়ে যাক। তারপরে শুরু হবে পেয়ারা।

পরম খুশী হয়ে তিনজন যেন ওর খৈনি টেপার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চোখ টেপাটিপি ক'রে পরস্পরের দিকে তাকালাম ও একটা চোরা হাসি হাসলাম।

অর্থাৎ সুখনলালের কাছে একটা কিছু গোপন করলাম।

আপনারা নিশ্চয়ই কিছু আন্দাজ করেছেন ইতোমধ্যে। তা তো বটেই।

যদি এখন বলি যে, আমাদের তিনজনের বাড়িতেই সুকোমলবাবুর প্রশংসায় কানে তালা লেগে গিয়েছিল।

আমরা কান খাড়া করলেই যে যার ঘরের দেওয়ালে, সিঁড়িতে, মেঝেয়, এমন কি কড়িবরগার গায়ে বাড়ি খেয়ে খেয়ে কথাগুলি উড়ছে, ঝরছে ও আমাদের গায়ে পড়ছে, শুনতাম। 'বিয়ে করবে বিয়ে করবে। আধুনিক ছেলে। আহা, এমন তৈরী জামাই পেলে আমরা যে হাতে চাঁদ পাব। সোনা দিয়ে গড়া পাত্র।'

বাবা বলতেন, ছন্দার জেঠা বলতেন, রেবার মামা বলতেন।

কিন্তু তাঁদের সাহস হচ্ছিল না, কথাটি গিয়ে সুকোমলবাবুর কানে তোলেন।

লজ্জা জিনিসটা সংক্রামক। তা ছাড়া, তখন যুগটাই খুব ভব্য-সভ্য ছিল। যেন সুকোমলের লাজুক চেহারা ও চালচলন দেখে এ পক্ষ অর্থাৎ আমাদের অভিভাবকরাও চুপ ছিলেন।

সত্যি বলতে?

যে যার ঘরে থেকেই পা বাড়িয়ে রেখেছিলাম।

সেই আমলের আর দশটি মেয়ের মত দশ বছর বয়েস থেকেই মা-মাসিরা আমাদের মধ্যে একটা বিয়ে-মন পাকিয়ে তুলেছিলেন।

বলতে কি, ষোল-সতের বছর বয়সে এক-একজন পা দিতে না-দিতেই সংসারটাকে বিয়ে, স্বামী, স্বামীর রোজগার, নিজের ঘরবাড়ি, এমন কি অগুনতি পুত্রকন্যার চেহারায় ভরতি ক'রে চোখের সামনে সারাক্ষণ একটা মনোহর চিত্র জাগিয়ে রাখতাম।

তার উপর এত বড় বাগান, গ্যারেজ, পুকুর, লন নিয়ে এমন ছিমছাম এক বাড়ি।

আমার তো মনে হচ্ছিল, যদি কেউ আমাদের বুকের মধ্যে একটা জায়গায় হাত রাখত তো টের পেত, একটা শিরা ধুক্‌ধুক্ ক'রে কাঁপছিল, আর দ্রুত অন্য কোন শিরার রক্ত টানতে টানতে কেবল একটা কথার বুদবুদ তুলছিল, দশ দিন কেন—আজ, এখন, এই মুহূর্তে দার্জিলিং মেলে চাপতে প্রস্তুত।

কিন্তু মনের সেই কথা তো আর দারোয়ানকে বলা যায় না! বরং উল্‌টোটাই বললাম, আর হাসলাম।

অল্প সময়ের মধ্যে তিন-চারবার খৈনির রস গিলে সুখনের বেশ নেশা ধরেছে, বোঝা গেল। চোখে জল এসে গেছে। হাসিটাকে আরও মদির ক'রে বলল, 'আপনাদের একটা সোন্দর জিনিস দেখাব, দিদিমণি—ঘরে আসুন।'

'কি আর দেখাবি! আমাদের তো সব দেখা হয়ে গেছে!' রেবা হাসল।

'হ্যাঁ, এক বাকি আছে তোর বাবুকে সামনাসামনি দেখার। তোর বাবুকে এনে দেখাতে পারবি? হ্যাঁ, তিনজনের সামনে। ধর, লোকটার হাত-মুখ-নাক-চোখ সব আছে—কেবল কথা বলতে পারে না।' বলে ছন্দা সব ক'টা দাঁত দেখিয়ে হিহি হেসে উঠল।

আমি ছন্দা ও রেবাকে ধমক দিলাম, 'এই, তোরা বড্ড বাড়াবাড়ি করছিস, চুপ কর।'

যেন আমার মনে হল, লক্ষ করলাম, রেবা ও ছন্দার বেহায়াপনায় লজ্জা পেয়ে সুখন আর একপ্রস্থ লাল হয়ে উঠেছে।

লজ্জা ঢাকতে বেচারা মুখ নামিয়ে দরজার তালা খুলতে অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠল।

কিন্তু ছন্দা-রেবা তাতেও ওকে রেহাই দেবে না। সুকোমলবাবুর ঘরে ঢুকতে তারা যে কত ব্যস্ত, বোঝা গেল, দরজার উপর ঝুঁকে প্রায় সুখনের নাকের সঙ্গে দুজন খোঁপা ঠেকিয়ে চাবি ঘোরাচ্ছে। তালাটি কি খারাপ হয়ে গেল! কালও বেশ খুলছিল।

দুটি কোমল হাত চাবির হাতলে ঠেকতে তালা নিমেষের মধ্যে খুলে যায়। চোরের মতন ওদের পিছনে পিছনে আমিও ল্যাভেণ্ডারের গন্ধে নরম ঘুম-পাওয়া ছায়ায়-ভরা সুকোমলবাবুর শয়নকক্ষের মাঝখানটিতে গিয়ে দাঁড়ালাম।

দুটো সুটকেস নামিয়ে একটা কালো ছোট বাক্সের ডালা খুলে সুখন আমাদের জন্যে জিনিসটি বার ক'রে নিয়ে এল।

সুকোমলবাবুকে।

আমরা তাঁকে সামনাসামনি দেখতে চেয়েছি শুনে বুদ্ধিমান সুখন এই কাণ্ডটি করল, বুঝতে কষ্ট হল না। নাক-মুখ-চোখ-হাসি নিয়ে আমাদের সামনে ভদ্রলোক উপস্থিত অথচ কথা বলছেন না।

ফটোটা নিয়ে তিনজনে কাড়াকাড়ি।

রেবা সবার চেয়ে বেশীক্ষণ ওটাকে চোখের সামনে দাঁড় করিয়ে করিয়ে দেখতে লাগল।

সুপুরুষ। কোনও পুরুষ দুই চোখে এত রূপ ধরে রাখতে পারে, আমাদের ধারণা ছিল না। সুন্দর ভুরু। তাঁর চোখে, নাকে, চিবুকে, কপালে কোন একদিন বিয়ে করেছিল, সেই চিহ্ন আঁতিপাঁতি ক'রে আমরা খুঁজে পেলাম না। যেন চব্বিশ বছরের কুমার। ফটোর উপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছিলাম সব। বলব? বলতে কি, আমাদের নিশ্বাসের সঙ্গে কামনার সাপ কিলবিল ক'রে বেরিয়ে এসে সেই ফটোর উপর যেন ছোবল মারছিল। আমরা এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম যে, ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে সুখনলাল এক-দৃষ্টে তাকিয়ে থেকে আমাদের কাণ্ড দেখছিল। যখন সেদিকে চোখ পড়ল, মনে হল, একটা কুকুর লুব্ধ চোখ মেলে আমাদের খাওয়া দেখছে। তা ছাড়া কি! ছবির সেই পুরুষকে আমরা (এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম) তিন কুমারী সেদিন রাক্ষুসে ক্ষুধা নিয়ে গিলতে চেয়েছিলাম, যুবক সুখন কি তা

বোঝে নি? বাড়াবাড়ি করছিলাম ফটোটা নিয়ে। ছন্দা একসময় ওটা ওর ব্লাউজের মধ্যে ঢুকিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। এতটা বাড়াবাড়ি করেছিলাম বলেই আমাদের এমন শাস্তি পেতে হল। বলছি। সেদিন সুখনকে তিনজনে এক টাকা ক'রে বকৃশিশ দিয়ে ঘরে ফিরে এলাম। 'আবার দেখব এসে ফটোটা কাল—কাল, পরশু এবং বাকি যে ক'দিন তিনি এখানে আছেন, বুঝলি! সাবধান, তিনি যেন টের না পান! আসবার সময় সুখনকে বলে এলাম বটে, কিন্তু তিনজনেরই বুকের মধ্যে তার উল্‌টো ইচ্ছাটা ধিকিধিকি জ্বলছিল। না, শুধু ছবি না—মানুষ, রক্তমাংসের সুকোমলকে চাই। কিন্তু সে কথা মুখ দিয়ে কে বার করে! বার করা মাত্র বাকি দুই সখী শত্রু হবে, তিনজনেই জানতাম।

পরদিন।

দিনটা আরও উজ্জ্বল। হল্‌দে রোদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রজাপতিরা বালিগঞ্জ প্লেসের সেই শূন্য মাঠের উপরে উড়ে বেড়াচ্ছিল। অন্যদিন হলে আমরা একটা-দুটো প্রজাপতি যে না ধরতে চেয়েছি, তা নয়; কিন্তু সেদিন একবারও ওদের দিকে তাকাতে ইচ্ছা হয় নি। আমাদের বেশভূষার পারিপাট্যই সেদিন চোখে পড়ার মতন ছিল। ভালো শাড়িটি, ভালো ব্লাউজটি গায়ে উঠেছে। টান ক'রে খোপা বাঁধা হয়েছে। চোখে কাজল, কপালে টিপ। সবুজ ঘাসের উপর দিয়ে তিনজন যখন হাত ধরাধরি ক'রে চলছিলাম, তখন নিজেদের আলতা-পরা ফরসা টুকটুকে পায়ের দিকে তাকিয়ে (আহা, আজকাল মেয়েরা জুতো দিয়ে পা ঢেকে রাখে বলে আলতা পরতে পারে না) আমরা মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিলাম।

কিন্তু এত তোড়জোড় ক'রে সুকোমলের বাগানে ঢুকে সুখনকে অনুপস্থিত দেখে আমাদের বুক দমে গেল। কি ব্যাপার? দরজায় তো তালা ছিলই, জানলাগুলি পর্যন্ত বন্ধ দেখলাম। কোথায় গেল দারোয়ান? সুখন নেই—তার অর্থ, আমরা আর ভিতরে ঢুকতে পারব না। ঘরে যেতে না পারার অর্থ, আজ আর সুকোমলকে দেখা হবে না। হ্যাঁ, সেই ফটো। আজও বেশ কিছুক্ষণ ওটা বুকের কাছে ধরে রেখে (কি বিশ্রী নেশায় পেয়ে বসেছিল আমাদের) তিনজন চেয়ে চেয়ে দেখব, রাত থেকে ঠিক ক'রে রেখেছিলাম। কিন্তু সুখনই নেই, তখন কিসের কি!

ছটফট করতে লাগলাম বারান্দার সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে। পেয়ারার ক'টা কচি পাতা ছিঁড়লাম। সত্যি বলতে কি, লিচু গাছটার দিকে যেতে আমাদের আর মোটে ইচ্ছা করছিল না। আমরা যে অনেক ভিতরের দিকে পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম! সুকোমলের গাছ, পাতা, পাখি, ফুল, আলোছায়া-ভরা বাগান নিয়ে মেতে থাকবার দিন অনেক আগেই ফুরিয়েছে। দারোয়ান সুখন তা শেষ ক'রে দিয়েছে। সে আমাদের অন্তঃপুরের লোভ দেখিয়ে এগুলো ফিকে ক'রে দিলে। কিন্তু পাজিটা আজ গেল কোথায়! সত্যি, ভীষণ রাগ হচ্ছিল হিন্দুস্থানীটার উপর। বেরসিক, বোকা। মনে মনে ওর মুণ্ডপাত ক'রে ফিরে আসব, এমন সময় হঠাৎ যেন আমাদের মনে হল, বাঁ দিকে বাড়ির ভিতরে ঢোকবার ছোট্ট দরজার একটা পাল্লা খুলে গেল। বাতাস? সুখন কি আজ ভিতরের বারান্দায় ঘুমিয়ে আছে? কোথায় সুখন! প্রায় পাঁচ মিনিট চোখ-কান খাড়া রেখে সেদিকে তাকিয়ে থেকে তিনজন রীতিমত ঘামতে লাগলাম।

আহা, যদি আমরা তখন পালিয়ে আসতাম! কিন্তু তার উপায় ছিল না। অদৃশ্য সুকোমল শক্ত হাতে তিন কুমারীকে টেনে ধরেছিল। শুনুন তার পরের ঘটনা।

দরজার সেই খোলা পাল্লার উপর স্থির চোখ রেখে তাকিয়ে তাকিয়ে ভিতরে একবার উঁকি দিয়ে দেখে আসব কিনা যখন চিন্তা করছিলাম, হঠাৎ তিনজন একসঙ্গে চমকে উঠলাম। যেন কে কেশে উঠল। সুখন? কিন্তু সেরকম তো মনে হল না! আমাদের বুকের ভিতর ঢিবঢিব করছিল। পরস্পরের মুখের দিকে তাকাই।

'তুই যা, তুই যা।' আমি ফিসফিসিয়ে ছন্দাকে বললাম, 'উঁকি মেরে একবার দেখে আয় তো!'

'তুই যা, তুই।' ছন্দা রেবাকে বলল।

'দেখেই চলে আসিস।' আমি রেবার হাতে আস্তে চাপ দিই। 'ভয় কি, আমরা তো এখানে আছিই!'

'হ্যাঁ, আমাদের চেয়ে তোর সাহস বেশী।' ছন্দা চোখ টিপল। 'আর, যদি দেখিস যে সুখন, তবে তো কথাই নেই। ওর কানে ধরে হিড়হিড় ক'রে টেনে তুলবি। কালও এক টাকা ক'রে বকশিশ দেওয়া হয়েছে। বাড়িতে লুকিয়ে হারামজাদার নাক ডাকিয়ে ঘুম বার ক'রে দিবি।'

'কিন্তু', খোলা পাল্লার দিকে চোখ রেখে রেখে রেবা ফিসফিসিয়ে উঠল, 'এ কি ঘুমের মানুষের কাশি বলে তোদের মনে হয়? আমার তো মনে হচ্ছে, যেই কাশুক, জেগে আছে।'

'তা থাক, আর কেউ হলে তুই তখনই চলে আসবি। উঁকি মেরে তো দেখা।'

'হ্যাঁ, চৌকাঠের ওধারে একবার শুধু গলা বাড়িয়ে ভিতরটা পরীক্ষা করা। সে আর এমন কি!'

যেন আমাদের ফিসফিসানি শুনতে পেয়ে পেয়ারা গাছের মগডালে বসে একটা কাক স্বরটাকে কর্কশ ক'রে ঠাট্টা করার মত শব্দ ক'রে দু-তিনবার ডেকে উঠল। তখন মনে হয় নি, আজ মনে হচ্ছে।

রেবাকে ভিতরে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা দুজন কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হ্যাঁ, দুশ্চিন্তা তো ছিলই। যদি সুকোমল হয়? যদি ভয় হজম ক'রে রেবা আর একটু ভিতরে চলে যায়? যদি—

মেয়েরাই মেয়েদের সবচেয়ে বেশী অবিশ্বাস করে। সুতরাং রেবাকে একলা পাঠিয়ে ভুল করেছি কি ইত্যাদি ভেবে ভেবে দুজন যখন সারা হয়ে যাচ্ছি, পুরো তিনটে মিনিট কেটে গেল, তখন আস্তে আস্তে শ্রীমতী বেরিয়ে এল।

'কি ব্যাপার?' আমরা রুদ্ধশ্বাস হয়ে ওর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ি। 'সুখন কি? চুপ ক'রে আছিস কেন?'

রেবা আস্তে মাথা নাড়ল। ঈষৎ হাসল। তারপর কানের কাছে মুখ সরিয়ে এনে যা বলল, শুনে আমি ও ছন্দা স্তম্ভিত।

একটু সামলে নিয়ে দুজন একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম, 'উত্তরে তুই কি বললি?'

'কিছু না। ভীষণ লজ্জা করছিল। চলে এলাম।'

'আহা, লজ্জার কি!' ছন্দা ও আমি একসঙ্গে মুখিয়ে উঠলাম, 'বলছিলেন একটু চা ক'রে দিতে, না-হয় দিতিস।'

'ধেৎ!'

ফিক্ ক'রে হেসে, যেন লজ্জা ও সংকোচটা ক্রমশ বাড়ছে, রীতিমত লাল হয়ে উঠে আমাদের দুজনকে অবাক ক'রে দিয়ে রেবা বাগানের রাস্তা ধরে আস্তে আস্তে বেরিয়ে গেল। এই সাহস, এতটা মনের জোর নিয়ে তুই এসেছিলি! চিৎকার ক'রে আমাদের বলতে ইচ্ছা হল।

'তুই যা।' ছন্দা আমার কাঁধে হাত রাখল।

'তুই যা।' আমি ছন্দার হাতে হাত রাখলাম।

বস্তুত, দুজন একসঙ্গে যাওয়া যায় কিনা, তাও চিন্তা করলাম। কিন্তু তাতে ফল অন্যরকম হতে পারে। হয়তো রাগ করবেন। হয়তো চাঁদা চাইতে গেছি মনে ক'রে দেখা মাত্র হাত তুলে আর অগ্রসর হতে নিষেধ করবেন। অনেক বলার পর ছন্দা রাজি হয়। 'কেমন ভয়-ভয় করছে।' বলল ও। পিঠে হাত বুলিয়ে ওকে সাহস দিই, 'ভয় কি? বাঘ-ভাল্লুক তো নন!' ছন্দাকে পাঠিয়ে আমি আবার কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে সময় গুণি। এক মিনিট, দু মিনিট —আস্তে আস্তে রেবার মত ছন্দাও একসময় বেরিয়ে এল। কি ব্যাপার!

'কি ব্যাপার?'

ছন্দার মুখ দিয়ে কথা সরছে না। কপালে ঘামের ফোঁটা। চুপ ছিল বলে ওর হাতে জোরে মোচড় দিই। 'কি বলছিলেন? চা ক'রে দিতে?'

ছন্দা অল্প হেসে মাথা নাড়ল।

'তবে?'

'চিরুনিটা চেয়েছিলেন।'

'কোথায় ছিল ওটা?'

'ঘরে—টেবিলের উপর।'

'তিনি কোথায়?'

'বারান্দায় বসে আছেন।'

'তাতে হয়েছে কি!' রুষ্ট হয়ে সখীকে ধমক দিলাম। 'না-হয় ঘরে গিয়ে চিরুনিটা এনেই দিতিস!'

'ধেৎ!' ছন্দা মাথা নাড়ল। 'ভীষণ লজ্জা করছিল আমার, মাইরি! তুই যা, তুই গিয়ে দেখ—'

কথা অসমাপ্ত রেখে বাগানের রাস্তা ধরে ও ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল।

উল্লাস, ভয়, কৌতূহল, দুঃসাহস, লজ্জা, ত্রাস, সংকোচ ও দুর্নিবার লোভ বুকে নিয়ে এক-পা এক-পা ক'রে কাঠের দরজার দিকে এগিয়ে গেলাম। আমি, আমি। আমারই শেষ পর্যন্ত জয় হল। ওরা লজ্জা পেয়ে, ভয় পেয়ে পালিয়ে গেছে। সামনে আর কেউ নেই, পিছনে কেউ নেই, পাশে কেউ নেই। যেন ঈশ্বরই এমন ক'রে দিলে, ভাবলাম। আমি পারব। এগুলো পরীক্ষা। চিরুনিটা আমার হাতে তুলে দাও, একটু চা কর, ফুল-দানিটা টেবিলের ওপাশে সরিয়ে রাখ। এটুকুন যদি না পারলাম, এই যদি না করলাম তো—

চিন্তায় ছেদ পড়ল।

ভিতরের উঠোনে পা দিতে চোখে পড়ল বারান্দার ওধারে চুপ ক'রে একজন বসে আছেন। এদিকে পিঠ। আহা, যদি তখনও আমি ফিরে আসতাম! কিন্তু তার সাধ্য ছিল কি! রূপবান পুরুষের যৌবনমণ্ডিত সুশ্রী সুঠাম দেহ যেন একটা বড় আলো হয়ে জ্বলছিল, আর একটা পোকা হয়ে আমি সেদিকে ছুটে চলছি। না, চোখ বুজেছিলাম—তখনও অন্ধের মত এগোচ্ছি। না হলে আমার আগেই দেখতে পাওয়া উচিত ছিল, এত বড় একটা ব্রোমাইড ফটো সামনে টিপয়ের উপর দাঁড় করিয়ে রেখে তিনি ধ্যানস্থ। সদরের চৌকাঠ থেকে সেটা চোখে পড়ার কথা। কিন্তু তা আর হল কই!

সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে থমকে দাঁড়াই। আর পা সরল না। আমার দু পা কাঁপছিল। কি ভীষণ অপরাধ করেছি, রজনীগন্ধার মালা-পরানো ফটোর তলায় লেখাটায় উপর চোখ পড়তে বুঝলাম। হ্যাঁ, তাঁর পরলোকগত স্ত্রী। পাশে জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ দেওয়া থাকাতে বুঝতে আরও সহজ হল, আজ বিদ্যুৎ-প্রভার জন্মদিন। এক দিকে ধূপ জ্বলছে, আর এক দিকে দীপ। ছবির সামনে-পিছনে ডাইনে-বাঁয়ে বড় বড় রজনীগন্ধার ঝাড়। বুঝি রজনীগন্ধা প্রিয় ফুল ছিল বিদ্যুৎপ্রভার।

বস্তুত, এমন স্থিরনিবিষ্ট চোখে সুকোমল ছবির দিকে তাকিয়েছিলেন যে, আমি পুরো দু মিনিট সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সত্ত্বেও তিনি টের পেলেন না। একবার এদিকে তাকান নি।

মুখ চুন ক'রে ভারি পায়ে আস্তে আস্তে সেখান থেকে সরে এলাম। বাগান। বাগানের রাস্তা ধরে বাইরে চোরকাঁটায়-ভরতি মাঠে। কোন্ লজ্জা ঢাকতে রেবা-ছন্দা আমার আগেই মিথ্যা কথা বলে পালিয়ে গেছে, বুঝতে কষ্ট হয় নি। কানের পাশ দিয়ে দুটো শালিক ঝগড়া করতে করতে উড়ে গেল। ঝাপসা চোখ তুলে লিচু আর পেয়ারা গাছে ঢাকা সাদা বাড়িটা আর একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম। হ্যাঁ, অপমানে আমার কান্না আসছিল।

গানের ফুল

গলির ওপারে থাকেন জলধরবাবু, এপারে আমরা। আমাদের দোতলা মেসের বারান্দা থেকে জলধরবাবুর পাঁচিল দেখা যায়। দোকানবহুল অঞ্চলে গৃহী হিসাবে আমরাই তাঁর একমাত্র প্রতিবেশী।

আমি তখন নতুন এসেছি এই মেসে। প্রতুল এখানকার পুরনো বাসিন্দা।

তাই দেখলাম, প্রতুলের উপর এদের উৎপাত বেশী। প্রতুলকে চেনে বেশী জলধরবাবুর ছেলেমেয়েরা।

ভোর হবার আগে, বলতে গেলে কাক না ডাকতে, গুটিগুটি চলে আসে সাতজন। অন্তু, নন্তু, সন্তু, মীরা, রেবা, শিপ্রা আর সবচেয়ে ছোট দেড় বছরের একটি প্রাণী জহর। বড়টির বয়স বোধ হয় বারো পূর্ণ হয় নি।

প্রতুলের কাছে মুড়ি, চিনি থাকে। কখনও চিনাবাদাম বা এমনি একটা কিছু।

ওরা সাতজন মুড়ি খায়, চিনাবাদাম চিবায়।

সাতজন সাতজনের ভাগ নিয়ে প্রথমে খাওয়া আরম্ভ করে, নিচে মেঝের সিমেন্টের উপর চুপচাপ বসে। তখন ওরা লক্ষ্মী, ভারি শান্তশিষ্ট। তারপর যার ভাগ আগে ফুরোয়, তার উৎপাত শুরু হয়। এবং তখন থেকে শুরু হয় অশান্তি, আর কেউ শান্তশিষ্ট থাকে না। কার আগে কে এসে ভাগ বসাবে ভয়ে মুড়ির ঠোঙ্গা নিয়ে ছুটোছুটি আরম্ভ হয় সারা ঘরে, বারান্দায়, এমন কি পায়খানার দরজায়, কলঘরে, নিচের নর্দমায় চিৎকার-মারামারি পর্যন্ত।

প্রতুল বলে, 'এই দুর্দিনে ভদ্রলোক এতগুলি ছেলেমেয়ে নিয়ে আছে কি ক'রে?'

আমি বলি, 'তুমি এখানে আগে থেকে আছ, তোমারই তো জানবার কথা! কি করেন ভদ্রলোক?'

'ইস্কুলের মাস্টার।'

'মাইনে?'

'ষাট। ডিয়ারনেস এলাওএন্স্ পঁচিশ।'

'পঁচাশি।'

মাথা নেড়ে প্রতুল বলল, 'এই মাইনেয় একটি-দুটি প্রাণীর চলতে পারে। কোনরকমে। খেয়ে-বেঁচে।'

প্রতুলের শঙ্কা আমার মুখেও লেগেছিল। তথাপি হাসলাম।

'তুমি একলা সোয়া শ' টাকা নিজের জন্যে খরচ করছ। বিয়ে কর নি জীবনের মান বজায় থাকবে না বলে। ত্রিশ পুরেছে জেনেও। কিন্তু সবাই তো আর একরকম নয়!'

'এই দারিদ্র্য কি স্বেচ্ছাকৃত নয়?' প্রতুল বলল, 'জলধরবাবু বার্থ-কন্‌ট্রোল কথাটা নিশ্চয় শুনেছেন!'

'খুবই মোটা কথা।' বললাম, 'তোমার আইডিয়া তো নাও মিলতে পারে। স্বতন্ত্র জীবনদর্শন।'

'ওর জীবনদর্শনের নমুনা যদি এই হয়ে থাকে তো এমন জীবনের খুরে শত শত প্রণাম!' বলে প্রতুল চুপ করল।

আমিও ভাবলাম প্রতুলের কথাটা।

লেখাপড়া শিখেছেন জলধর দাশ। অঙ্কের মাস্টার। তা হলেও স্বাস্থ্য-বই তিনি নিশ্চয়ই পড়েছেন! তিনি জানেন, কতটা খাদ্য রোজ মানুষের দরকার। ভয়ংকর এক-একটা দুর্ভিক্ষ যাচ্ছে বছরের পর বছর। দেশ জুড়ে হাহাকার।

এসব দেখে, চোখের উপর না খেয়ে মানুষ মরেছে জেনেও কি ক'রে লোকটি বছর বছর···আর এসব দেখাশোনা ছাড়াও সন্ততিদের এক-একটির অস্থিপঞ্জরের উপর চোখ রেখেও তো তিনি ক্ষান্ত হতে পারেন!

প্রতুল বলল, 'আমি বলব, এরাই দেশের প্রথম শত্রু, এই মূর্খের দল।'

বললাম, 'সে সম্বন্ধেও হয়তো তাঁর মতভেদ আছে—কে শত্রু, আর কে নিপীড়িত। হয়তো জলধরবাবু দেখছেন, এই সত্য, বিবাহিতের স্বাভাবিক ধর্ম। তাঁর সন্ততিদের সম্পূর্ণ আহার জুটছে না দেখে তিনি অবশ্যই নিশ্চিন্ত হয়ে নিশ্চয়ই বসে নেই। হয়তো ইস্কুলের মাস্টারি ছাড়াও গোটা দুই-তিন টুইশানি করছেন। মাইনে বাড়াবার জন্যে কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে লড়ছেন, উষ্মা প্রকাশ করছেন, ক্ষুব্ধ হচ্ছেন, ক্রুদ্ধ হচ্ছেন, আর ভাবছেন তিনিই নির্যাতিত। এতগুলি সন্তান নিয়ে সংসারে ভালভাবে থাকবার অধিকার তাঁর আছে। এর ডবল ছেলেমেয়ে নিয়েও কি কোন কোন লোক মহাসুখে আছে না?'

বক্তৃতার মত কথাগুলি হয়ে গেছল আমার।

শুনে প্রতুল অল্প-অল্প হাসল।

'আয় বাড়াবার মত খাটবার অথবা মাইনে বাড়ানোর মত লড়বার ক্ষমতা জলধরবাবুর নেই। এ কথা তিনি নিজমুখে স্বীকার করেন। বলেন, আমি কে, আমি কতটুকু করতে পারি ওদের জন্যে? আর, করলেই বা নেয় কে? সংসারে কোটিপতিরও তো দুঃখ আছে! যার সন্তান নেই। ঐশ্বর্য ভোগ করবে কে? এই বঞ্চনার শোকে সে পাগল। ভাবে, এত অর্থ না থেকে যদি তার একটি সন্তান থাকত! সুতরাং এ দিক থেকে কি আমি কোটি-পতির চেয়েও সুখী নই, প্রতুলবাবু? জলধরবাবু বলেন, এরাই আমার ধনরত্ন, মণিমাণিক্য, সোনাদানা—আমার অন্তু নন্তু, শিপ্রা, রেবা, জহর, সন্তু, মীরা। টাকা-টাকা ক'রে মাথা গরম ক'রে বাইরে যতক্ষণ ছুটোছুটি করব, ততক্ষণ, আমি মনে করি, এদের সঙ্গে বসে গল্প করলে বরং সুখ পাব বেশী। শান্তি। মোটা-ভাত মোটা-কাপড়ে আমিও মানুষ হয়েছিলাম, আমার সন্তানেরাও না-হয় তাই হবে। আর, অদৃষ্টে সুখ থাকলে তা থেকেও কেউ ওদের বঞ্চিত করতে পারবে না, আমি এও বলছি। কাজেই—'

জলধরবাবুর কথা বলা প্রতুল শেষ করে নি, অন্তু, নন্তু এবং ছোট বাকি পাঁচজন কলহবিবাদ সাঙ্গ ক'রে হাত ধরাধরি ক'রে আবার প্রতুলের বিছানার পাশে চলে এসেছে অর্থাৎ সব ক'টির মুড়ি ফুরিয়েছে।

বক্তৃতাটা ওরাও খানিকটা শুনল মনোযোগ দিয়ে প্রতুলের মুখের দিকে তাকিয়ে।

তারপর ওরা আমার দিকে ঘুরে দাঁড়াল। অর্থাৎ লক্ষ করল, এই কথার পর আমার মুখে কোনও প্রতিক্রিয়ার ছাপ পড়েছে কিনা।

হেসে অন্তু তখনই তর্জনী তুলে আমায় প্রশ্ন করল, 'ধন বড়, কি জন বড়?'

রেবা হঠাৎ ছোট্ট বেণী দুলিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে আবৃত্তি আরম্ভ করল, 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে দানিয়াছ খ্রীস্টের সম্মান, কণ্টকমুকুটশোভা—'

রেবার শেষ হতে হাত নেড়ে নন্তু বলল, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে কেহ নাই।'

সর্বকনিষ্ঠ জহর থেকে আরম্ভ ক'রে সর্বজ্যেষ্ঠ অন্তু পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে হাত ধরাধরি ক'রে গলা মিলিয়ে গান করল, 'পৃথিবীর মায়া কাটাব বলে উদাসীর সাজ সেজেছি মা।'

করুণ গম্ভীর সুর। কান পেতে শুনলাম।

গান শেষ ক'রে ওরা আমার মুখের দিকে তাকাল।

বললাম, 'সুন্দর। কে শিখিয়েছে? তোমাদের বাবা?'

মাথা নেড়ে মীরা বলল, 'অর্ধেক বাবা শিখিয়েছে, অর্ধেক শিখিয়েছে মা।'

প্রতুল ও আমি দৃষ্টিবিনিময় করলাম।

কিন্তু আমার প্রশংসাবাণীতেই ওরা সন্তুষ্ট ছিল না। সন্তু এক পা এগিয়ে এসে বলল, 'কই, আপনি তো আমাদের কিছু দিলেন না?'

'হবে।' প্রতুল শান্ত করল নন্তুকে। 'উনি তো কাল সবে এসেছেন মেসে!'

'ও, উনি তা হলে এখানেই থাকবেন?'

প্রতুল মাথা নাড়ল।

নন্তু এবং তার ছ'টি ভাইবোন তখন খুশী হয়ে আমায় ভাল ক'রে দেখল।

সবচেয়ে ছোটটিকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললাম, 'তোমার নাম কি ভাই?'

'জহর।' জহরের বড় বোন শিপ্রা বলল, 'আমাদের আর একটি ভাই হলে বাবা বলেছেন, নাম রাখবেন পান্না।'

'পান্নার পর ভাই হলে মা বলেছেন, নাম রাখা হবে চুনি।' বলে মীরা আমার চোখে চোখে তাকাল।

ঠোঁট টিপে একটু হাসল। রেবা, শিপ্রা ওর পিছনে দাঁড়াল।

'সুন্দর নাম।' মীরার মাথায় হাত রেখে বললাম, 'আর বোন হলে? নাম ঠিক করেছ?'

হয়তো তাও মীরা বলত। বাধা পড়ল। ভদ্রলোক হাসতে হাসতে এসে ভিতরে ঢুকলেন। জলধরবাবু।

'ও মশাই, রক্ষা করুন! তিনটি আছে, আর মেয়েটেয়ে নয়।' বলে তিনি প্রতুলের সঙ্গে একবার চোখ টেপাটেপি ক'রে ফের আমার দিকে মুখ করলেন, 'অবিশ্যি আমি যে মেয়েছেলের পক্ষপাতী নই, তা নয়। লোকে বলে, মেয়ের বিয়ে দেওয়া এক সমস্যা। আমি বলি, ওটা একটা সমস্যাই নয়। মেয়ে কবে বড় হবে, ওর বিয়ে দেব—অনেক দূরের কথা। তার আগে আমি মরতে পারি, বিয়ে অবধি মেয়ে নাও বাঁচতে পারে। তা ছাড়া, এটা আধুনিক যুগ। বিয়ের সময় হলে মেয়ে যে বিয়ে করবেই, তার স্থিরতা কি? বরং যা তোমার করবার, সেটি কর; হ'ক না ছেলে, কি মেয়ে। শিক্ষা দাও, ওদের মন গঠন কর, উদার ও পরিচ্ছন্ন আলো ফেলে শিশুর চিত্তকে বড় ক'রে তোল। যা স্থায়ী হবে, যা থাকবে জাতির সম্পদ হয়ে চিরকাল। তাই নয় কি, প্রতুলবাবু?' প্রতুলের দিকে একবার দৃষ্টি দিয়ে জলধরবাবু আমার চোখে

তাকালেন। 'তা ছাড়া সন্তানের জন্যে বাপ-মা আর কি করতে পারে? আর, করলেই বা নেয় কে? আজ তুমি ঘটা ক'রে মেয়ের বিয়ে দিলে, কাল ও বিধবা সেজে ঘরে ফিরে এল—সংসারে এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। মানুষের জন্যে মানুষের করবার ক্ষমতাই বা কতটুকুন! বরং যদি তুমি ওকে এমন শিক্ষা দাও যে, পৃথিবীর চরমতম দুঃখকেও তার দুঃখ বলে মনে হয় না, দৈন্যের দিকে তাকিয়েও সে উপেক্ষার হাসি হাসে, অন্তরের শক্তি দিয়ে পৃথিবীর শোকতাপ জয় করে, বুঝব, সেখানেই তোমার বাপ-মা হওয়ার সার্থকতা, সন্তানের জন্যে তুমি কিছু-একটা তবু করলে। আমার তাই অভিমত।' হেসে সামনের একটা চেয়ারে বসে জলধরবাবু একটু চুপ করলেন। একটু পর আবার তিনি বললেন, 'প্লেন লিভিং অ্যাণ্ড হাই থিংকিং—এত কাণ্ডের পরও কিন্তু কথাটাকে আমরা আমল দিচ্ছি না। গান্ধি চিৎকার ক'রে ক'রে গুলি খেয়ে মরলেন, রোলাঁ স্তব্ধ হয়ে আছেন, তবু হিরোশিমা পুড়ল, পৃথিবী আর একটা ধ্বংসের ভয়ে দিনরাত কাঁপছে। জিজ্ঞেস করি, কেন? এর জন্যে তো একটা মানুষ দায়ী নয়, বা একটা জাত! সবাই—আমরা এ যুগের মানুষ মাত্রেই ঘরে ঘরে প্রতিদিন লালন করছি, পালন করছি জড়বাদী, বস্তুবাদী ধ্বংসাত্মক এক-একটি মন। আজকের শিশুই কাল বড় হয়ে জগতে বিরাট ধ্বংসানল সৃষ্টি করবে, পুড়ে মরবে—তুমি ভাবছ ওর বিয়ের ভাবনা, ভাবছ ব্যাঙ্কে ওর নামে কিছু টাকা রাখতে পারলে কি পারলে না, আদ্দি-মলমল্ গায়ে উঠল কি উঠল না। ছি ছি, কি সংকীর্ণ আইডিয়া! কত অনুদার ও কুৎসিত মনোবৃত্তি!'

জলধরবাবু থেমে দেওয়ালের দিকে চোখ রাখলেন, 'আমার আইডিয়া অন্যরকম।' একটু পরে, যেন নিজের মনে আরম্ভ করলেন, 'কি নেই, কি হচ্ছে না ভেবে মাথা খারাপ করার চেয়ে কি তোমার আছে, কি তুমি করছ, সে দিকে বরং দৃষ্টি দাও।'

হঠাৎ প্রতুলের মুখের দিকে চেয়ে জলধরবাবু হাই তুললেন। 'কালকের কথা এখনও আপনাকে বলা হয় নি, প্রতুলবাবু। কাল কি হয়েছিল, জানেন?'

প্রতুল মুখ তুলল।

'কাল চারুশীলা, মানে আমার স্ত্রী, বলছিল, বাচ্চাগুলো অনেক দিন মাছমাংস খায় না, ভিণ্ডিসিদ্ধ চলছে। কাল র'ববার আছে, দুপুরবেলা একটু মাংস হ'ক্।'

'তারপর?' ঈষৎ হেসে প্রতুল বলল, 'আজ বুঝি বাজার চললেন মাংস আনতে?'

'আরে, শেষ করতে দিন কথা!' হাত নেড়ে জলধরবাবু বললেন, 'শুনলে অবাক হয়ে যেতেন আপনারা, আমার ন' বছরের মীরা ও কথার উত্তরে কি বলেছিল। ভিণ্ডিসেদ্ধ খাব মা, কাল দুপুরে ভিণ্ডি হ'ক। মাংস রান্না মানে সারা দুপুর কাটবে তোমার হেঁসেলে মাংস সেদ্ধ করতে, মাঝখান থেকে আমার আর সে গানটি শেখা হবে না।'

'বলেছিল মীরা?' প্রশ্ন করলাম আমি।

'হ্যাঁ।' চোখ বড় ক'রে জলধরবাবু বললেন, 'কেন বলবে না, বলুন। ছোটবেলা থেকে, একেবারে জন্ম থেকেই কি ওরা শুনছে, কি শিখছে?' জলধরবাবু সুন্দরভাবে হাসলেন। 'তাই বলে মাংসের চেয়ে ভিণ্ডি ওর কাছে প্রিয় মনে করবেন না আবার—বরং তার উল্‌টো। কিন্তু হলে হবে কি, মাংসের চেয়েও প্রিয়তর, শ্রেয়তর রসের সন্ধান ওরা পেয়েছে।'

'গান?' বললাম আমি।

'তার মানে মনের সৌন্দর্যবোধ, রুচির উৎকর্ষ—তাই নয় কি?'

আমি আস্তে মাথা নাড়লাম।

'সাতটি সন্তান আমার', গলা পরিষ্কার ক'রে জলধরবাবু বললেন, 'আর সবগুলোই এখনও নাবালক—বড় ছেলে অন্ত গত আশ্বিনে মাত্র এগারোয় পা দিয়েছে, কিন্তু শুনলে অবাক হবেন—খাওয়া বা পরা, কি শোয়া নিয়ে আমার সংসারে একটু হৈ-চৈ গণ্ডগোল নেই, এতগুলো বাচ্চা থাকলে যা হয় সকলের ঘরে।'

'সুখের সংসার।' প্রতুল এবার কথা বলল। 'মিসেস খুব ভাল গান গাইতে পারেন, মন্মথ।' বলে সে আমার দিকে তাকাল।

'ও, আপনি বুঝি এখানে নতুন এসেছেন?' যেন এতক্ষণ পর খেয়াল হল জলধরবাবুর, আমি নবাগত। 'ভাল, নমস্কার।' দু হাত একত্র ক'রে তিনি যথারীতি অভিনন্দন জানালেন।

প্রতুল পরিচয় দিল আমার। বলল, 'আমার বন্ধু।'

কিন্তু মাস্টার মশাই আর ও কথায় তেমন যেন কর্ণপাত করলেন না। মোটা মাংসল চিবুকে পুরু ভাঁজ পড়েছে। মনে হল, বিশেষ একটা কারণে ভদ্রলোক গর্বিত, অতি মাত্রায় উল্লসিত হয়ে আছেন। চোখে পুরু পাথরের চশমা, গায়ে ময়লা খদ্দর, গ্রন্থিযুক্ত একটা কাপড় পরনে, আর সস্তা ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে।

মনে হল, সকল দৈন্য ও মালিন্যের উর্ধ্বে তিনি সযত্নে ধরে রেখেছেন মুখের হাসি। সেটা আমার সত্যি ভাল লাগল।

হেসে জলধরবাবু বললেন, 'ভাল গাইতে পারেন বলে যে তিনি রেডিওতে গান দিচ্ছেন বা গানের রেকর্ড করছেন, তা আবার ধরে নেবেন না। এ যুগের ছেলে আপনারা-'

'না, সে একটা কথা নাকি!' বললাম, 'রেডিও-রেকর্ড করাই তো সব নয়!'

'আমি এগুলো আন্তরিক ঘৃণা করি। এগুলো হল গানের শো, গান বেচে পয়সা। বললাম তো, মানুষের লক্ষ্যই এখন এক দিকে—শুধুই চাকৃতি।'

চুপ ক'রে রইলাম।

'চারুশীলার সঙ্গে আমার আইডিয়া মেলে। রেকর্ড-রেডিওর নাম শুনতে পারে না ও। ঘরের কাজকর্ম সেরে যতটা সময় পায়, ছেলেমেয়েদের নিয়ে বসে এক-আধটু শেখাতে। ওতেই ওর তৃপ্তি, গান জানার চরম সার্থকতা। চারুশীলা বলে, ফুল জন্মাতে পারে সবাই, কিন্তু ওতে উপযুক্ত রং আর মধু দিতে পারে ক'জন? আমার গান সত্যিকারের ফুল হয়ে ওদের মধ্যে ফুটে উঠুক, এই আমি চাই—আমার সন্তু, নন্তু, রেবা হবে এক-একটি গানের ফুল। গান বেচার ব্যবসা ক'রে লাভ হত কতটুকুন!'

সন্তু, নন্তু, রেবা কেউ সেখানে দাঁড়িয়ে ছিল না। অনেকক্ষণ চলে গেছে। থাকলে সব ক'টিকে আবার ভাল ক'রে দেখতাম।

রোগা ডিগ্‌ডিগে, কংকালসার চারুশীলা দেবীর সাতটি আধ-ফোটা ফুল রূপে-রসে ভরে উঠে জাতির সম্পদ হিসাবে একদিন গণ্য হবে কিনা ভেবে প্রতুল হয়তো মুখ ফিরিয়ে ঠোঁট বাঁকা ক'রে হাসল, টের পেলাম।

আমি তাড়াতাড়ি বললাম, 'ওরা সবাই সুন্দর গাইতে জানে।'

'আপনি শুনেছেন গান?' জলধরবাবুর চোখ বড় হয়ে উঠল।

বললাম, 'ওদের আবৃত্তিও সুন্দর।'

'ওগুলো আমি শেখাই।' চোখ বুজে জলধরবাবু মৃদু হাসলেন। আর গুন্‌গুন্ ক'রে, মনে হল, তিনি সেই কবিতাই আবৃত্তি করলেন। 'হে দারিদ্র্য, তুমি মোরে—'

প্রতুল কি বলতে যাচ্ছিল।

জলধরবাবু চোখ খুললেন।

'প্রতুলবাবু বিয়ে করেন নি। অনেক দিন বলেছি, সন্তান হওয়ার চেয়েও আনন্দ সন্তান গড়ে তোলায়। উঃ, সে যে কি সুখ, ভাষা দিয়ে বোঝানো যায় না!'

বললাম, 'আমিও ব্যাচেলার।'

'হলেনই বা! বিয়ে করবেন না বলে তো আর প্রতুলবাবুর মত আপনিও প্রতিজ্ঞা ক'রে বসেন নি!' আড়চোখে প্রতুলকে আবার দেখে জলধরবাবু সশব্দে হাসলেন। তারপর গম্ভীর হয়ে মাথা নেড়ে আস্তে আস্তে বললেন, 'নেচারকে আমরা অস্বীকার করছি, মশাই—সমাজের শৃঙ্খলা তাতে ভেঙ্গে পড়ছে। আমাদের অভাব, আমাদের অশান্তির মাত্রা দিন-দিন বাড়ছে বই কমছে না।' এবং এ কথার পর জলধরবাবু উঠলেন। বললেন, 'বাজারের তাড়া আছে।'

'তার অর্থ—তাড়াতাড়ি রান্নাবান্না সেরে জলধর-গিন্নি গানের ক্লাস নিয়ে বসবেন।' জলধরবাবু চলে যাওয়ার পর প্রতুল টিপ্পনি কাটল।

বললাম, 'লোকটি সরল।'

প্রতুল বলল, 'সরল মূর্খ। অর্থনীতির ক-খ জ্ঞান থাকলেও ভদ্রলোক বেঁচে যেত।'

হেসে বললাম, 'অর্থকে তিনি নিরর্থক মনে করেন, বক্তৃতা শুনলে না এতক্ষণ? দারিদ্র্যের কণ্টকমুকুট পরে তিনি—'

'সৃষ্টির নেশায় মশগুল।' এক চোখ ছোট ক'রে প্রতুল বলল, 'শিগগির চুনি কি পান্না আসছে।'

আমি বললাম, 'তোমার মুড়ির ঠোঙা আরও বড় করতে হবে যে!'

'তা বটে।' অল্প হেসে প্রতুল বেরিয়ে গেল।

দুপুরবেলা। একলা শুয়ে আছি ঘরে। গলির ওপারে পাচিলের ও পিঠে জোর গানের মহড়া চলছিল।

অনেকগুলি শিশুর কলকাকলির মাঝখান থেকে মসৃণ অপূর্ব এক নারীকণ্ঠ থেকে থেকে ভেসে এল।

এবং সে যে কতক্ষণ ধরে ও কি অমিত উৎসাহ নিয়ে সংগীতসাধনা চলল, আমি বেশ টের পেলাম।

তখন প্রায় বেলা শেষ।

আমি জানতাম না, গান শেখা শেষ ক'রেই সেই মুহূর্তে ওরা আমার কাছে ছুটে আসবে।

সকালে প্রায় সব ক'টি উলঙ্গ ছিল।

এ বেলা দেখলাম অন্তু, সন্তুর পরনে ছোট ছোট পেণ্টুলন। যেন পুরনো বালিশের খোল কেটে তৈরি করা হয়েছে, আর বড় দু মেয়ে অর্থাৎ মীরা আর রেবার গায়ে পাতলা হলুদ রঙের ছোপ-দেওয়া দুটি ফ্রক। যেন কাপড়টা কিসের একটা পরদা ছিল। কেটে ফ্রক তৈরি করা হয়েছে। কাপড়ের পাড় দিয়ে পরিপাটি বেণী বাঁধা তিন মেয়ের—চোখে একটু কাজল উঠেছে, লক্ষ করলাম। ছেলেগুলোর মাথায় চিরুনির আঁচড় পড়েছে কতকাল পর।

মেসে আমি নতুন মানুষ এসেছি বলে, নাকি আজ আবার একটি নতুন গান শেখা হল, তাই এই সজ্জাড়ম্বর, ভাবছিলাম।

'গান শুনবেন ?' অন্তু প্রথম প্রস্তাব করল। সার বেঁধে আমার বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিল সাত ভাইবোন।

বললাম, 'গাও।'

সুর বেঁধে সাতজন আমায় গানটি গেয়ে শোনাল :

জীবন যখন শুকায়ে যায়
করুণাধারায় এসো—

গান শেষ ক'রে একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইল সবাই। তারপর সন্তু বলল, 'কই, আমাদের কিছু দিলেন না ?'

'সকালবেলাও কিছু দেন নি।' মীরা ও শিপ্রা একসঙ্গে মুখ নাড়ল।

ভয়ংকর অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম। মুড়ি বা চিনাবাদাম—কিছুই আমি সংগ্রহ ক'রে রাখি নি। বেশ অনুতাপ হল।

তখনই বললাম, 'নিশ্চয় দেব, এই নাও।' তাড়াতাড়ি একটা আধুলি বার ক'রে মীরার হাতে দিলাম।

ভোমরার মত আর দুটি ওকে ছেঁকে ধরল। তারপর আনন্দে চিৎকার করতে করতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল সব।

একটু পর, হঠাৎ দেখি, দরজায় বড় ছেলে ও মেয়েটি, অন্তু আর মীরা। বেশ মুখভার দুজনের।

কিছু বলবার আগে আমার কোলে একটুকরো কাগজ ও একটা আধুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আবার ওরা বেরিয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

দেখি, কাগজটায় লেখা আছে: আপনাদের কাছে আমার অনুরোধ, আর যাই দিন, ওদের হাতে পয়সা দেবেন না—পয়সা দিয়ে ওদের ভিক্ষুক হতে শেখাবেন না। ইতি—

অন্তু, নন্তু, সন্তু, মীরা, রেবা, শিপ্রা ও জহরের মা।

সারাটা বিকেল বারান্দায় রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে পাঁচিলটার দিকে চেয়ে রইলাম। চারুশীলা দেবীকে দেখতে আমার এমন ইচ্ছা হচ্ছিল!

রিফ্রিজারেটার

বড় বেশী দেখছে ও ওকে। ক'দিন ধরে দেখে দেখে যেন আশ মিটছে না।

এভাবে দেখতে আসার, দেখতে চাওয়ার অর্থ কি? সুকৃতি বিশ্লেষণ করে নিজেকে, নিজের মনকে। কেন এই অদম্য ইচ্ছা বারবার এ ঘরে চুপি দেওয়ার। কি আছে এখানে, কি এমন ভাল লাগছে রজতবাবু যখন অফিস থেকে ফিরবেন বেবি বই ফেলে সাত-তাড়াতাড়ি ক'রে উঠে ইলেক্‌ট্রিক স্টোভ জ্বেলে চা-জলখাবার তৈরি করতে লেগে গেছে দেখতে।

তবু সুকৃতি দেখে।

বেণী দুলিয়ে বেবি প্লাগ জুড়ে দেয়। তারটা টেনে নিয়ে আসে টেবিল অবধি। টেবিলে বসানো নতুন-কেনা ঝক্‌ঝকে স্টোভ। উনিশ বছরের নতুন গৃহিণীর ছোট্ট ছিমছাম সবে-পাতা সংসার। রোদের শেষ রেখা জানলার বেগুনী পরদাকে কোমল লাল ক'রে দিয়েছে। আর সেই রক্ত-আভা এসে লেগেছে মেয়েটির গালে, কপালে, নীলাভ ধূসর চোখে।

সুকৃতি চোখ ফেরাতে পারে না কতক্ষণ।

'আসছে মাসে একটা লিফ্‌ট পাবে ও, শ' খানেক টাকা ইন্‌ক্রিমেন্ট হবে হয়তো।' কেট্‌লিতে জল ঢালতে ঢালতে বেবি চোখ তুলল। 'তখন, তবে যদি আরও ক'টা জিনিস করতে পারি। এ মাসে রেডিও কেনা হল।'

'রেডিও ছাড়া চলে না।' সুকৃতিও বলল আস্তে, ঢোঁক গিলে।

'চার শ' টাকা মাইনে পাচ্ছে, তবু আমি খরচে কুলোতে পারি কি?' বেবি অল্প হাসল। 'নিজের হাতে তো হিসাব রাখি—দেখছি। মানুষ তো দুজন!'

'বেশ পাকাপোক্ত গিন্নি হয়ে গেলি ক'দিনে।' সুকৃতি না হেসে, না বলে পারল না। তারপর গম্ভীর হয়ে রইল।

মুখ নামিয়ে বেবি স্টোভে কেটলি চাপায়। ফার্-লাগানো গরম কোট গায়ে। ডিসেম্বরের ক'লকাতা। এমন কোন শীত নেই যে, দুপুরবেলা ঘরে থেকেও গায়ে কোট রাখতে হবে। বেবি বলছিল তখন, 'আর একজনের

নির্দেশ। বুঝলি। একটু সর্দি হয়েছে, সকাল থেকে ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে —আমার ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা হবে, এই ওর ভয়। ক'লকাতায় ভয়ানক ইন্‌ফ্লুয়েন্‌জা হচ্ছে।'

শুনে সুকৃতি চুপ ক'রে ছিল। অর্থাৎ এ ঘরে সে পা দিতে না-দিতেই যে বেবি স্বামী সম্পর্কে একটা-না-একটা কিছু সুকৃতিকে বলবে, সুকৃতি জানত। 'ভয়ংকর সাবধানী লোক।' বেবি দু-তিনবার ক'রে বলছে কথাটা। যেন বলতে ওর ভাল লাগছিল।

মন্দ লাগছে না কোট গায়ে বেবিকে। সুকৃতির চেয়ে চিরদিনই ও বেঁটে। রং সুকৃতির চেয়ে ফরসা কি? ছিল না। বিয়ের পর গায়ের রং একটু খুলেছে; কিন্তু সেজন্যে না। অদ্ভুত সুন্দর লাগছে মেয়েটিকে অন্য কারণে। কি সেই কারণ, বারবার দেখেও সুকৃতি ঠিক আন্দাজ করতে পারছে না। খোঁপার পরিবর্তে পিঠে বেণী ঝুলছে। সিঁথিতে সিঁদুরের ছিটে। পায়ে চটি, তবু আলতার ছোপ লেগে থাকে, ও এখানে এসেছে পর থেকে লক্ষ করে সুকৃতি। এক থাক সোনার চুড়ির মাঝখান থেকে একটা রিস্টওআচ উঁকি দেয়। আগে কান খালি ছিল ওর। এখন মস্ত বড় দুটো রিং ঝুলছে দু কানে। এইজন্যে, এর জন্যে কি বেবিকে অন্যরকম লাগছে, ভাবে সুকৃতি। বিয়ের পর রাতারাতি কি ভয়ংকর বদ্‌লে যায় মেয়েদের চেহারা। যেন বেবির আগের চেহারা, রংপুর থাকতে ছ মাস আগেও যা দেখে এসেছিল সুকৃতি, মনে আনতে চেষ্টা করে।

'গিন্নি না হয়ে উপায় কি?' হঠাৎ মুখ তুলল বেবি।

'আর কার বিয়ে হয়েছে?' প্রশ্ন করে সুকৃতি।

'জানি না।' বেবি কেট্‌লির উপর চোখ রাখে। 'তুই চলে আসবার ঠিক এক মাস পরেই আমার বিয়ে হল যে! তারপর আমি চাটুগাঁ চলে গেছি। আমার মেজ ভাসুর সেখানে রেলওয়ে ইন্‌জিনিয়ার কিনা! আঃ, কি সুখে ছিলাম দুটো মাস! তুই তো যাস্ নি চাটুগাঁ। টিলার উপর ছবির মত সুন্দর বাড়ি। হ্যাঁ, ভাসুর আট শ' টাকা মাইনে পায়, আরও বেশী বোধ হয়।' চকিতে ভুরু কোঁচকাল বেবি। 'আমি ঠিক জানি না। গাড়ি আছে নিজের। পিয়ানো আছে বাড়িতে। আমার ভাসুরের বড় মেয়ে, তেরো কি চোদ্দ তো বয়েস হবে মোটে, ভারি চমৎকার বাজাতে পারে। আর, কি গলা! আমার মেজ জার গানবাজনার দিকে খুব ঝোঁক কিনা, তাই মেয়েকেও তৈরি করছে তেমনি।'

চুপ ক'রে সুকৃতি শুনল। আর কার বিয়ে হয়েছে জানতে গিয়ে সুকৃতি বেবির বিয়ে-হওয়া জীবনেরই খানিকটা উচ্ছ্বাস আবার শুনল। কেট্‌লির গরম জল দিয়ে পেয়ালা-পিরিচ ধোয়া শেষ ক'রে বেবি এবার কেট্‌লির বদলে দুধের সস্‌প্যান চাপিয়েছে উননে। 'এখনও ওর ফিরতে পনর মিনিট বাকি। ছানাটা আগে ক'রে নিই।' অপাঙ্গে হাতঘড়ি দেখে নিয়ে সুকৃতির চোখে চোখ রাখল বেবি। 'একটু চা খাবি, সুকৃতি?'

'না, অভ্যাস নেই।'

'অভ্যাস!' গলার অদ্ভুত শব্দ ক'রে বেবি জানলার দিকে তাকায়। 'অভ্যাস বলতে কিছু আছে নাকি রে! ও আপনি হয়ে যায়। অভ্যাস বদলাতেও এক মিনিট সময় লাগে না।'

যেন কি বলতে বেবি থামল, ঠোঁট টিপে হাসল।

'তোর বুঝি এখন খুব চায়ের অভ্যাস হয়েছে?' এমনি হাতের কাছে আর কোনও কথা খুঁজে না পেয়েই সুকৃতি বলল, 'তাই না?'

'চা আমায় ও এক বেলা খেতে বলছে। ওবলটিন এনে দিয়েছে কাল; বলছে, সকালে ওটা খেও।'

সুকৃতি চুপ ক'রে শুনল।

বেবি বলল, 'আমার শরীর, আমার স্বাস্থ্যের দিকে ভয়ংকর নজর ওর।'

'স্বাস্থ্য তোর আগের চেয়ে ভাল হয়েছে।' সুকৃতি না বলে পারল না।

'সত্যি বলছিস? সত্যি?' খুশির ভঙ্গিতে বেবি ঘাড় কাত করল, দেওয়ালের আয়নায় নিজেকে একবার দেখে নিয়ে হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

সাজানো-গোছানো ঘর। জানলার ঠিক নিচে ছোট্ট টিপয়। বাঁ পাশে আল্‌না। বেবির একটা খয়েরী রঙের শাড়ি কুঁচিয়ে রাখা হয়েছে, রজতবাবুর একটা ধুতি। আলনার এক হাত দূরে সুন্দর খাট। পাশাপাশি দু জোড়া বালিশ। বিছানার অর্ধেকটা সুজনি দিয়ে ঢেকে রাখা হয়েছে। অর্ধেকটায় দুধের মত সাদা ধব্‌ধবে চাদর।

'জিনিসপত্তর এখনও সব ক'রে উঠতে পারি নি।' বেবি বলল। সুকৃতি ঘাড় ফিরিয়ে ঘরের চারদিক দেখছিল বলেই কি বেবি কথাটা না বলে পারল না—'একটা ড্রেসিং টেবিল না হলে চলে না।'

'হবে আস্তে আস্তে।' বেবির চোখে চোখে তাকাল সুকৃতি। ওর ছানা তৈরি করা হয়ে গেছে।

'খারাপ করেছি কি?'

'কি ?' বেবির হাতের ছানার ডেলায় চোখ রেখে সুকৃতি প্রশ্ন করল। কিন্তু বেবির মনে অন্য কথা।

'মেয়েছেলের জীবন, বলা যায় না কিছু। মামাবাবু বলতে রাজি হয়ে গেলুম।' বিয়ের কথা। ওর বিয়েতে রাজি হওয়া। সুকৃতি চুপ ক'রে রইল। ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বিয়ের কথা ছাড়া আর কিছু বলবে না বেবি এখন, সুকৃতি বুঝল।

ছানার ডেলায় চিনি চটকে ও সন্দেশ তৈরি করছে স্বামীর জন্যে।

'চললাম।' সুকৃতি ঘুরে দাঁড়ায়।

'কাল দুপুরে এসো কিন্তু।' বেবি দরজা পর্যন্ত আসে।

সিঁড়ি বেয়ে সুকৃতি নিচে নেমে এল।

রংপুরের বেবি। কবে ওর বিয়ে হয়ে গেল। আর এখানে এসে এই বাড়িতেই উঠল। উপরে ফ্ল্যাট নিয়েছে।

হ্যাঁ, সুকৃতির বান্ধবী। একসঙ্গে পড়ত দুজন স্কুলে। একসঙ্গে বড় হচ্ছিল। এই তো সেদিন।

অদ্ভুত লাগে সুকৃতির, অদ্ভুত লাগছে বেবিকে হঠাৎ এভাবে একটা ঘরে কোন্ এক রজতবিকাশের অর্ধাঙ্গিনীবেশে ছোট্ট হাত চালিয়ে টুক্‌টাক সংসারের কাজকর্ম করছে দেখে।

ছোট্ট সংসার। দুজন মানুষ।

একটা খাট, একটা উনন।

ছোট একখানা ডেকচি, সস্‌প্যান দুটো, দুটি চায়ের পেয়ালা দুজনের। পুতুলের সংসার। বেবি দরজায় পরদা খাটিয়েছে কাল সারা দুপুর।

পড়ার ঘরে চুপচাপ বসে সুকৃতি বেবির ঘরের ছবি আঁকে। মামার সংসারে বড় হচ্ছিল ও, যেমন সুকৃতি আছে দাদা-বৌদির কাছে। বেবি পেয়ে গেছে এখন নিজের সংসার।

মেয়ের জীবন। বলা কি যায়! পরম নিশ্চিন্ততার হাই তুলে ও সুকৃতির দিকে তাকিয়েছে, তাকায়। কেননা, সুকৃতির এখনও বিয়ে হয় নি। তাই কি ?

'ভবিষ্যতে তোমার জীবন কেমন হবে, তার স্থিরতা নেই। হাবভাবে, কথায়, চাহনিতে এ কথাই কি ও আজ দু দিন ধরে, মানে এখানে এসেছে পর থেকে, সুকৃতিকে বলতে চাইছে না, যখনই সে ওর ঘরে ঢুকছে ?

হ্যাঁ, এত সুখ, এমন সুখী আমি। বলছে বেবি।

আশ্চর্য, ভাবে সুকৃতি, বিয়ে সম্পর্কে বলতে গেলে একরকম উদাসীন অন্যমনস্ক যখন ও (সেদিনও বৌদির কথা সে হেসে ঠেলে উড়িয়ে দিয়েছে), ঠিক তখনই কুমারীত্বের খোলস ছেড়ে ঝল্‌মলে প্রজাপতিটি হয়ে উড়ে এল ওর সামনে ওর বয়সের এক মেয়ে। এসে রং ছড়াচ্ছে, গন্ধ বিলোচ্ছে।

সাদা শূন্য দেওয়ালের গায়ে চোখ রেখে সুকৃতি স্থির হয়ে রইল। সামনে পড়ার বইগুলো ছড়ানো। সন্ধ্যা থেকে একটার পাতা উল্‌টোয় নি সে। যেমন দুপুরবেলা বেবি তার পড়ার বই ছুঁয়ে দেখে নি।

'কি হবে ওসবে! আমার কি আর এখন এসব সাজে! তুই বল, সুকি।' খুশির আভায় দীপ্ত হয়ে থেকে থেকে বেবি বলছিল, 'পড়াশোনা তোর, তোদের, যাদের বিয়ে হয় নি। আমি আর কেন!' চাটগাঁর ভাসুরের দেওয়া হীরার আংটির উপর চোখ রেখে, মামাশ্বশুরের দেওয়া লকেটের গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে, কানের রিং কাঁপিয়ে, আর একশ'বার রজত-বাবুর আদর ক'রে কিনে দেওয়া গরম কোটের বোতাম লাগাতে লাগাতে বলছিল ও, 'শোন্ তবে, কাল রাত্রে কি কাণ্ড করছিল ও। ক'টা তখন রাত—'

রজতবিকাশের গল্প আরম্ভ করেছিল বেবি।

সুকৃতির সঙ্গে এবার ওর ম্যাট্রিক দেবার কথা।

রজতবাবু চাইছেন, বেবি পরীক্ষা দিক। বিয়ে হয়েছে তাই বলে পড়া-শোনা বন্ধ করার আছে কি! পড়ুক। দরকার হয়, বেবির জন্যে টিউটর রেখে দেন তিনি। তাঁর ভারি শখ।

সুকৃতি দুপুরে দুপুরে বেবির কাছে যাচ্ছে দুজন মিলে একটু পড়াশোনা করবে বলে। ক'দিন বা বাকি পরীক্ষার!

'ওটা রেখে দিলাম তোর জন্যে।' ঠাট্টার সুরে বেবি বলে, 'এখনও যখন বর পেলি না, ঘসে-মেজে নিজেকে একটু পরিষ্কার ক'রে নে। বলা তো যায় না, কার ভাগ্যে কি আছে! হি হি—'

মানে, বর না জুটলে তোমায় চাকরি করতে হতে পারে। দাদার সংসারে আছ। বিয়ে না হলে এমন দিন আসবে, হয়তো যেদিন দাদা-বৌদি আঙুল দিয়ে রাস্তা দেখিয়ে বলবেন, 'যাও, অনেক মেয়ে খেটে খাচ্ছে দেশে এখন, লজ্জা নেই, চাকরি-বাকরি জুটিয়ে নাও একটা, নিজের ভরণপোষণের চেষ্টা কর।'

রংপুরের সেই নীহারের কথা তোর মনে নেই, সুকৃতি? সিঙ্গার মেশিন অফিসে চাকরি করত মেয়েটি—এ জন্মে আর বিয়ে হল না। যাকে দেখলে স্কুলে যাবার পথে একসঙ্গে আমরা সব হাসতুম। মুখে কাপড় চাপা দিয়ে হাসি গোপন করেছি, নিতান্তই ও যখন সামনে পড়ে গেছে। সেই রুদ্রাণী কাঙ্গালিনী বেশ, ছন্নছাড়া মূর্তি। মনে আছে?

কি, আমাদের স্কুলের বিজনমাসি? চল্লিশ পার না হতে ষাট বছরের মত গাল তুবড়ে গেছে, চামড়া গেল কুঁকড়ে। আজও বর জুটল না। মেয়েদের ড্রইং শেখাতে শেখাতে আঙুলে কড়া পড়েছে, চোখের রং গেছে ফ্যাকাশে হয়ে। বেশ ফরসা নয় কি বিজনবালা?

এমন। এমন হতে পারে তোমার অবস্থা। তাই তো মামাবাবুর কথায় ঝুপ ক'রে রাজি হয়ে গেলুম। বলা কি যায়! বুদ্ধিমতী, বিচক্ষণা আমি। নই কি?

বুদ্ধি-উজ্জল কালো চক্‌চকে চোখে সুকৃতির মুখ, চুল, চোখ ও আঙুল-গুলো চকিতে দেখা শেষ ক'রে বেবি যেন নতুন ক'রে নিজেকে দেখছিল, নিজের শরীর দেখতে দেখতে ও গুন্‌গুনিয়ে উঠেছিল। 'এই বয়স, এই শরীর। পুরুষস্পর্শ। অই উত্তাপ লেগে বুঁদ হয়ে আছে, লেখাপড়া এখন রেখে দে, সুকৃতি।'

ঘড়ির কাঁটা চারটের কোঠায় যেতে আহ্লাদে গদগদ হয়ে ও পুঁথিপত্র সব ঠেলে সরিয়ে রেখে বল্‌ছিল, 'আমার ছাই একটুও ইচ্ছে করছে না, পরীক্ষা দিই। সত্যি!'

'রজতবাবু রাগ করবেন।' বলছিল সুকৃতি।

'করুক রাগ।' একটু গম্ভীর থেকে পরে বেবি খিলখিল ক'রে হাসছিল। 'শোন্ তবে কাল রাত্রের কাণ্ড। রাত তখন ক'টা। খাওয়া-দাওয়া সেরে ফেলেছি দুজন। বিছানায় গেছি। বলছিল ও, এস লক্ষীটি, এখানে, লেপের নিচে, আমার বুকের কাছে, বসে একটু পড়বে, আমি পড়াব।'

'রজতবাবুর উৎসাহ!' বলতে গেছল সুকৃতি।

'ছেলেমানুষি।' উত্তর করেছিল বেবি। 'আমি ভাবছি, আমি ভাবছিলাম, আমাদের বসবার ঘরে কার্পেট না থাকে থাক, অন্তত একটা সোফা না হলে চলছে না, ওদিকে ওর আবার একটা ভাল স্যুটের অর্ডার দেওয়া হয়ে গেছে। এ মাসে দুধের খরচ কমাব, কি ওর সিগারেটের, না দিনের বাজারখরচ, ঠিক

তখনই ও তুলল কিনা পড়ার কথা, আমার বিদ্যা।' ঈষৎ রুষ্ট শোনাচ্ছিল বেবির গলা মুখে হাসি থাকা সত্ত্বেও।

'বিদ্যা দিয়ে তিনি তোমায় চক্‌চকে করতে চাইছেন, সুন্দর।' বান্ধবীকে বোঝাতে চেয়েছে সুকৃতি।

'আর আমি চাইছি সুন্দর করতে ওকে, ওর সংসার।' বেবি দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল।

এখন এখানে নিজের পড়ার টেবিলে বসে সুকৃতি তেম্‌নি দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কি হবে, কি হয় মেয়েদের বই-পড়া বিদ্যায়—

ঝক্‌মকে স্বামী, ঝল্‌মলে সংসার। বেবির। বেবি হৃষ্ট হচ্ছে, কখনও রুষ্ট স্বামীর উপর। যেন ও বুঝতে পারছে না, কেমন ক'রে জীবন ধরবে, কতটা এর প্রসার, কি সুর।

রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে সুকৃতি বেবির সামনে দাঁড়ালে, ওকে দেখলে।

আঁতকে উঠল, সুকৃতি ভয় পেল বইএর শক্ত মলাটের উপর হাত রাখতে গিয়ে। ওর নখের গোলাপ নীল হয়ে যাবে, চোখের কালো হবে ফ্যাকাশে ধূসর এই বই পড়ে পড়ে। বইএর স্পর্শ বাঁচিয়ে কাঠের মত শক্ত হয়ে বসে রইল সুকৃতি অনেকক্ষণ।

'সারা দিন মেয়ে অই করছে।' রাত্রে খেতে বসে দাদা বলল, 'অফিসে যাচ্ছি তখন, দেখি, বড় বড় ছুটো ফুলের টব্ নিয়ে আসছে রিক্‌শ ক'রে বাজার থেকে। সন্ধ্যাবেলা যখন ফিরছি, দেখি, জানলার কাঁচ সাফ করছে রগড়ে রগড়ে।'

'এই তো সময় এসব করবার।' বৌদি বলল, 'ছেলেপিলে হলে পারবে নাকি অত তকতকে ঝক্‌ঝকে রাখতে সংসার—না, পারবে এমন ছিম্‌ছাম থাকতে নিজে?'

সুকৃতি স্তব্ধ হয়ে শুনল। যেন ঝাঁজ আছে বৌদির গলায়, ঈর্ষার। অনেক দিন বিয়ে হয়েছে, আর বেবির এই সবে আরম্ভ, নতুন সংসার-রচনা, তাই কি?

মনে মনে হাসে সুকৃতি।

সন্ধ্যা থেকে ভারি ইচ্ছা হচ্ছিল তার, একবার উপরে যায়। এমনি। একটু ঘুরে আসা। সাহস পায় নি। রজতবিকাশ ঘরে থাকতে কি ক'রে আর সুকৃতি সেখানে যায়, যদি না বেবি ডাকে!

আশ্চর্য, সুকৃতির এখন মনে পড়ল, দু দিনের মধ্যে বেবি তাকে একবারও ডাকে নি রজতবিকাশের সামনে।

'ভয়ংকর হুঁশিয়ার মেয়ে।' সুকৃতি বলল মনে মনে। রাগ হল তার, দুঃখ হল, আর প্রবল অপ্রতিরোধ্য ঈর্ষা।

কিন্তু হলেই বা কি করতে পারে সে, কি করার আছে নিজের ঘরে চুপচাপ বসে থাকা ছাড়া! খাওয়ার পরও সুকৃতি তেমনি স্থির হয়ে বসে রইল। যেন সে অপেক্ষা করছে কিসের।

রজতবিকাশকে সুকৃতি দেখেছে যদিও। লং কোট গায়ে, স্লিপার পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নামছিল তখন। ধীর-স্থির-গম্ভীর প্রকৃতির। তুলনায় বেবি একটু চঞ্চল, কাঁচা, যতই ও গিন্নিগিরি ফলাক, সুকৃতির মন বলেছে।

কিন্তু হলেই বা কাঁচা, চঞ্চল! রজতবিকাশবাবু বেবিকে একলা ফেলে তো আর বাইরে গিয়ে বসে থাকেন নি, আছেন ঘরে। রাত দশটা। খাওয়া-দাওয়া নিশ্চয় শেষ হয়েছে দুজনের। খাটের উপর লেপ মুড়ি দিয়ে ভদ্রলোক এখন স্ত্রীকে আদর ক'রে পড়াতে বসেছেন, বেবি মাথা নাড়ছে যদিও। বরের কাছে বেবির পড়া শেখা।

চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিয়ে সুকৃতি অনেকগুলো দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দাদা-বৌদির ঘরের আলো নিভতে সুকৃতি যখন ওর ঘরের আলো নিভিয়ে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়ায়, তখন নিজের কাছেই তা কেমন অদ্ভুত ঠেকে। সিঁড়ি বেয়ে সে উপরে ওঠে। বেবির ফ্ল্যাটের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়। দরজা ভিতর থেকে বন্ধ। আলোর সূক্ষ্ম রেখা বলে দিল, ওরা জেগে আছে। ঘুমোয় নি।

সুকৃতি স্থির হয়ে গেল।

সিগারেটের ধোঁয়ার ফিকে গন্ধ লাগল সুকৃতির নাকে।

চলে আসত ও, আবার দাঁড়াল। যেন ভারি একটা জিনিস, বই-টই কিছু, মেঝের উপর ছিটকে পড়ার শব্দ শুনে চমকে ওঠে সে।

'এটা ওর বাড়াবাড়ি, বেবির।' শুয়ে শুয়ে চিন্তা করল সুকৃতি। 'স্ত্রীকে পড়ানোর এত ইচ্ছা, আগ্রহ যদি রজতবাবুর, অন্তত স্বামীর মনরক্ষার জন্যেও বেবির মাঝে মাঝে এক-আধটু—'

'এর ও ওর ইচ্ছার মিলনই তো সংসার-রচনা!' অন্ধকার দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে সুকৃতি বলল অস্ফুট উচ্চারণ ক'রে। অনেক রাত অবধি সে ঘুমোতে পারে নি।

পরদিন। দুপুরে বেবির ঘরে যেতে দেখে, বেবি ভয়ানক গম্ভীর।

'এমন মনভার কেন ?' সুকৃতি প্রশ্ন করল।

'শোন্, কাল রাত্রে কি কাণ্ড হয়েছে, সুকৃতি।' বেবি বাঁকা ঠোঁটে হঠাৎ হাসল। শানিত হয়ে আছে দুই চোখ।

'কি ?' ঘন হয়ে দাঁড়ায় সুকৃতি।

'আমি ভাবি, ভাবছিলাম, আসছে তিন মাসের মধ্যে লাইফ ইন্সিওরের আর কোনও প্রিমিয়াম যখন দিতে হবে না, এ সময়টায় একটা রিফ্রিজারেটার কিনে ফেলা যায় কিনা, ঠিক তখনই কিনা ও তুলল—' সুকৃতি থামল।

'তোমার পড়ার কথা, বিন্তা ?' আস্তে আস্তে বলল সুকৃতি।

'না—হ্যাঁ—মহাবিন্তা।' গলার কেমন শব্দ ক'রে বেবি এক ঝলক নিশ্বাস ফেলল। 'চার শ' টাকায় দুজনের কি হয়, কি হতে পারে, তুই বল্, সুকৃতি। উনি আনতে চাইছেন আর একজন, একটি—' যেন নিজের মনে বেবি বিড়বিড় ক'রে উঠল, 'অদ্ভুত বিলাস বটে !'

থম্‌থম করছে বেবির মুখ, দেওয়ালের মত কঠিন শক্ত হয়ে গেছে ওর সর্বশরীর।

'অথচ একটা রিফ্রিজারেটারের খরচও তেমন বেশী নয়, ওর ফলটা-দুধটা রাখা চলে। আমার জন্যে কি, ওর জন্যেই এসব কেনা, ওরই তো সংসার !' বলছিল বেবি পায়চারি করতে করতে।

সুকৃতি লক্ষ করল, ওর গায়ে আজ কোট নেই, ঠাণ্ডাটা যদিও কালকের চেয়ে বেশী। দরজার ফুলের টবগুলো পড়ে আছে এলোমেলো, তখন পর্যন্ত সাজানো হয় নি একটা।

যেন সাপ দেখে সে ভয় পেল, ভূত দেখে আঁতকে উঠল। চৌকাঠের ওপারে পা বাড়িয়েছিল, পাটা সরিয়ে আনল। তারপর শরীরে ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে স্বল্পপরিসর করিডোর ও সিঁড়ি ক'খানা পার হয়ে সে নেমে এল নিচে ফুটপাথে। কিন্তু ফুটপাথে নেমেই কি সে দাঁড়াতে পারল স্থির হয়ে! ভূত ও সাপ তাকে ধাওয়া করেছে, যেন কোনও দিকে পালাতে হবে—এই স্থির প্রতিজ্ঞা নিয়ে সে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটল। পার হল বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, এল চঞ্চল জনমুখর কলেজ স্ট্রীট এবং তাই ধরে ছুটতে ছুটতে এক জায়গায় এসে সে হঠাৎ থামল। আর যাওয়া যায় না। কেননা, ঠিক সেই মুহূর্তে হ্যারিসন রোডের ট্রাফিক চলেছে। আর সেই মুহূর্তে যেন অনেকটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে জীবনে এই প্রথম পাশের পানের দোকান থেকে হাত বাড়িয়ে একটা সিগারেট কিনে নীলাদ্রি সিগারেট ধরালে। সিগারেটে টান দিয়ে সে খুক্‌খুক্ কাশল; ভীত, বিব্রত চোখে এদিক-ওদিক তাকাল দুবার; তারপর, তারপর যেন পৃথিবীতে আর কিছুতে ভয় নেই, কাউকে ভয় করে না—চোখ-মুখের এমনি দৃপ্ত কঠিন ভঙ্গি ক'রে পর-পর জোরে চার-পাঁচটা টান দিয়ে হাত থেকে একসময় সিগারেটটা ফেলে দিলে। ততক্ষণে হ্যারিসন রোড পরিষ্কার হয়ে গিয়ে কলেজ স্ট্রীটের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দিয়েছে। কিন্তু নীলাদ্রি ঠিক করতে পারছে না, কোথায় যাবে, কোন দিকে যাবে। একবার ভাবল, হাওড়ার পোল দেখে না সে কতদিন, সেদিকে যাবে। শেয়ালদার স্টেশন-প্ল্যাটফরম রিফিউজিতে ভরে গেছে, একবার গিয়ে উঁকি দিয়ে দেখে আসবে কি? নাকি কর্নওআলিস স্ট্রীট ধরে হাঁটতে হাঁটতে সোজা সে উত্তর দিকে চলে যাবে? কিন্তু তারপর কোথায় যাবে, কার কাছে? কর্নওআলিস স্ট্রীটেরও শেষ আছে। মোটের উপর, যেখানে দাঁড়িয়েছিল, সেখান থেকে এক পা নড়ল না নীলাদ্রি। বরং ঘাড় ফিরিয়ে যে রাস্তা ধরে এসেছিল, সেই রাস্তাটা বারবার দেখতে লাগল। না, আর ভয় নেই, ভয় নেই। আবার একসময় শরীরের তীব্র ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সেই পথ ধরেই সে এগিয়ে চলল। যাবার সময় পুঞ্জ পুঞ্জ বিদ্বেষ ও ঘৃণা সামনের রেস্তোরাঁর দরজা ও সিঁড়ির

উদ্দেশে ঢেলে রেখে সে গোলদিঘির বেড়ার ধারে চলে এল। রাগে, দুঃখে, উত্তেজনায় থরথর কাঁপছিল নীলাদ্রি। একটা জায়গায় সে স্থির হয়ে কতক্ষণ বসতে চায়। বেলা দুপুর। তা হলেও শেষ-কার্তিকের হেলে-পড়া সূর্য ইতোমধ্যে পার্কের চার-পাঁচটা বেন্‌চে ছায়া ছড়িয়ে দিয়েছে। গেট পার হয়ে সে আস্তে আস্তে পার্কে ঢুকল। কোণার দিকের একটা বেন্‌চে রুমাল বিছিয়ে বসল ও। নীলাদ্রির কান্না পেল, হাসি পেল। কতকালের পরিচিত এই কলেজ স্কোয়ার। কত লোককে এই দুপুরে চুপচাপ বসে থাকতে দেখেছে সে। দেখে কেবলই তার মনে হত, এরা বেকার, টি-বি রোগীর দল। কিন্তু একদিন একবারও কি তার মনে হয় নি, কোনও ব্যর্থ-প্রেমিক তার ব্যর্থতা, তার নিঃসঙ্গতা ভুলতে অথবা নিবিড়ভাবে তাকে উপলব্ধি করতে ঠিক এখানে চলে আসতে পারে! নীলাদ্রি দুই হাতে মুখ ঢাকল। তারপর একসময় যখন হাত সরিয়ে নেয়, দেখা গেল, তার চোখ দুটো বাষ্পাচ্ছন্ন। স্থির, অপলক দৃষ্টিতে কতক্ষণ সে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে, অদূরে ডাইভিং বোর্ডের পাটাতনের উপর বসে এক সারি দাঁড়কাক গা ঝাড়ছে, কখনও অলস মন্থর গলায় শব্দ ক'রে উঠছে। দিঘির নিষ্কম্প স্থির জলে তাদের ছায়া পড়েছে। মাথার উপর ধূসর নীলাভ আকাশে পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘের টুকরো ইতস্তত ছড়িয়ে। জলের ওপারে ট্রাম-বাস-মানুষের অস্পষ্ট চলমান মিছিল্। কান পাতলে তাদের শব্দ শোনা যায়। কিন্তু নীলাদ্রি আর একটা শব্দ শুনতে বুঝি কান খাড়া ক'রে ধরে। সেই শব্দ এখান অবধি এসে পৌঁছয় না, সে জানে যদিও। বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট ও হিন্দু স্কুলের অট্টালিকা-শ্রেণী শোভনার হাসির শব্দ আড়াল ক'রে রেখেছে। নীলাদ্রির পক্ষে এটা কল্যাণকর, সন্দেহ কি! কিন্তু সেই মুহূর্তে নীলাদ্রির মনে হল, রেস্তোরাঁর উত্তর কোণের প্রায়ান্ধকার টেবিলে পশুপতির পাশে নিরিবিলি বসে কফির পেয়ালায় চুমুক দিতে দিতে শোভনা সেন কি হাসছিল? নীলাদ্রিকে কি ওরা দেখতে পেয়েছিল? সেই সুযোগ নীলাদ্রি দেয় নি বটে। চৌকাঠের এপারে দাঁড়িয়ে দুজনকে সে আগে দেখে ফেলেছিল বলে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানাল। আ, শোভনা, শোভা—দেহে-মনে আবার একটা উদ্ধত উত্তেজনা অনুভব করল নীলাদ্রি। কিন্তু অনুভব করতে করতেও যেন কম্বল দিয়ে আগুন চাপা দেওয়ার মত সেই উত্তেজনা, অস্থিরতা সে তার শরীরের মধ্যে, রক্তের মধ্যে চেপে রাখল। তারপর স্থির, বিষণ্ণ, ম্রিয়মাণ চোখে পেঁজা তুলোর মত মেঘের টুকরো ও দাঁড়কাক-অধ্যুষিত ডাইভিং বোর্ডটা দেখতে লাগল। না, এটা সেই যুগ নয়। নীলাদ্রি ইচ্ছা করলেই এই মুহূর্তে

ছুটে গিয়ে রেস্তোরাঁর বিবরে ঢুকে বাঘের মত শোভনার গায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দর মুখ আর অনাবৃত শাদা সুঠাম বাহু দুটো দাঁত ও নখের আঁচড়ে ক্ষতাক্ত ক'রে দিতে পারে না। তা ছাড়া, বাঘের মত এত বড় দাঁত, ধারালো নখ তার নেই। আবার ইচ্ছা করলেও বিষ খেয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে, কি চলন্ত ট্রেনের তলায় লাফিয়ে পড়ে নীলাদ্রি আত্মহত্যা করতে পারে না। নীলাদ্রি পারে শুধু বিস্মিত বিমূঢ় হয়ে ভাবতে, ভাবতে আর শোভনা সেনের মত নির্লজ্জ, নিষ্ঠুর, বোকা, ব্যর্থ মেয়েদের ঘৃণা করতে, করুণা করতে। ব্যর্থ—ব্যর্থ। নীলাদ্রি না। ব্যর্থ হয়েছে ওই মেয়ে—শোভনা যার নাম। কি দাম রইল এতদিনের প্রেমের! প্রেমের অভিনয়? নির্ধূম দীপশিখা হয়ে তোমার ভালবাসা জ্বলবে, কেবল একটি হৃদয়ের জন্যে চিরজীবন জ্বালিয়ে রাখবে—চলায়-বলায়, ভাবে-ভঙ্গিতে, ঠারে-ঠমকে বড় যে দিনের পর দিন বিজ্ঞাপিত করছিলে, এই কি সেই? চিৎকার ক'রে এখান থেকে ডেকে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা হচ্ছিল নীলাদ্রির। এক দিন, একটা দুপুর। নীলাদ্রি কলেজে গেল না, চোখের আড়াল হল, আর সেই ফাঁকে—যেন এমন একটা দুর্লভ সুন্দর দিনের জন্যে শোভনা সেন কতকাল প্রতীক্ষা করছিল। ধনী, রূপবান ও বলতে গেলে তাদের ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে চরিত্রহীন লোফারের সঙ্গে রূপসী, বলতে গেলে ক্লাসের মধ্যে সবচেয়ে বিদুষী, মেয়েটি কার্তিকের শীত-পড়িপড়ি দুপুরে পর-পর কয়েক বাটি কফি ও প্লেট-ভরতি কাজুবাদাম, কেক, কটলেট, ডিম ও ফুলুরি খাওয়ার লোভ সংবরণ করতে পারলে না। হয়তো আর দশটি মেয়েকে চাখতে চাখতে এই দুর্লভ দিনের কোনও বিরল মুহূর্তে গাড়ি-চড়ে-আসা পশুপতি তালুকদার একবার মাত্র ঘাড় নেড়ে বলেছিল, এস। শোভনা ঠিক চলে এল। যেন প্রস্তুত হয়ে ছিল। পা বাড়িয়ে ছিল। পাখা পোড়াবার প্রহর গুণছিল। নীলাদ্রির চোখে জল এল। ধূর্ত, অবিশ্বাসিনী। চিৎকার ক'রে নীলাদ্রির বলতে ইচ্ছে হল, মেয়েদের এক লহমার জন্যে বিশ্বাস করে না, এমন পুরুষের সংখ্যা সারা পৃথিবীতে কেন এখনও সংখ্যায় অনেক বেশী। নিজের স্বভাব দিয়ে শোভনা তা উপলব্ধি করুক। একবার নিজেকে দিয়ে সে তা বিচার করুক। ধরা যাক, কেবল নিমন্ত্রণ রক্ষার খাতিরেই সৌজন্যবশত পশুপতির সঙ্গে ক্লাস পালিয়ে ও চলে এসেছে। যদি তাই হত, তাই করত শোভনা। কিন্তু তা না। চৌকাঠের এপারে থেকে একজন দেখে টের পেয়েছে, কেবলমাত্র দুটো কফির পেয়ালা না, অনেক ডিশ, কাঁটা-চামচ, জলের গ্লাস, বাটি, মশলাদানির পাহাড় জমে উঠেছে সামনে টেবিলে। কেবল

একটা ক্লাস ফাঁকি দেওয়া নয়, একটা আস্ত দুপুর, পুরো একটা দিন ওরা দুজন ওখানে বসে। নীলাদ্রি আজ কলেজে আসবে না জেনে ক্লাসে না ঢুকে সেই বেলা দশটা থেকে দুজন এসে ওখানে বসে গল্প করছে, খাচ্ছে। আরও কতদিন এভাবে লুকিয়ে পশুপতির সঙ্গে বসে শোভনা খেয়েছে, নীলাদ্রি মনে মনে এখন তা বেশ হিসাব করতে পারল। এ বিচ্—হোম্। দাঁতে দাঁতে ঘসে প্রায় শব্দ ক'রে নীলাদ্রি বলে উঠত। সামনে আগন্তুক দেখে নিবৃত্ত হল।

মহিলার সঙ্গে একটা কুলি। কুলির মাথায় ছোট একটা কাঠের বাক্স। রেডিও—নীলাদ্রি পরে বুঝতে পারল।

'আমি এখানে একটু বসতে পারি, বাবা—বেন্চের ওধারে ?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' চমকে মহিলার মুখের দিকে তাকাল নীলাদ্রি। 'আমি উঠে যাচ্ছি, আপনি বসুন।'

'না, না—উঠবে কেন ? তুমিও বসো।' হাতের থলেটা ঘাসের উপর নামিয়ে রেখে মহিলা বেন্চের এক পাশে বসেন। নীলাদ্রি উঠল না। মহিলা রূপবতী। প্রায় তার মার বয়সী অনুমান ক রে নীলাদ্রি মুখের দিকে বেশীক্ষণ তাকাতে পারলে না, মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

'এটা গোলদিঘি, বাবা ?'

'হ্যাঁ।' নীলাদ্রি চোখ তুলল। 'আপনি এখানে—ক'লকাতায় নতুন এসেছেন কি ?'

হঠাৎ এ প্রশ্নের উত্তর দেন না তিনি। স্থির, নিবিষ্ট চোখে একটু সময় দিঘির দিকে তাকিয়ে থেকে মৃদু হাসেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, 'না, আমি চিরকাল ক'লকাতায় কাটিয়েছি, বাবা। বড় তো একটা বেরোই না এখনকার বৌ-ছুঁড়িদের মতন রাস্তায়-ঘাটে। গোলদিঘি-লালদিঘির গোলমাল আমার আজও কাটল না।' মহিলা অল্প শব্দ ক'রে হাসলেন। নীলাদ্রিও হাসল।

'আমার ছেলেমেয়েদের চেয়ে তুমি বয়সে বড় হবে না। রুবি তোমার চেয়ে বছর খানেকের ছোট হতে পারে। ওই রুবি আমায় রাস্তায়-ঘাটে বার করতে আরম্ভ করেছে।'

কে রুবি, কি বৃত্তান্ত – প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হল নীলাদ্রির।

মহিলা বললেন, 'তুমি কোন্ কলেজে পড়, বাবা ?'

'স্কটিশ।' নীলাদ্রি কৌতূহলী চোখে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

'রুবির বেথুন। এবার ওর সেকেণ্ড ইআর। আমার দ্বিতীয় মেয়ে।'

নীলাদ্রি জলের দিকে তাকিয়ে ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলল।

'রুবিকে নিয়ে কি আমি কম যন্ত্রণা পোহাচ্ছি, বাবা!' মহিলাও দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'এই দুপুর রোদে ওর জন্যে আমাকে রেডিও কিনতে বেরোতে হয়েছে। কি করব। না কিনলে ওর কাঁদাকাটি থামছে না।'

'কি ব্যাপার, হঠাৎ রেডিওর জন্যে রুবির এত—' মুখে না, চোখের ভাষা দিয়ে নীলাদ্রি যেন প্রশ্ন করল। নীলাদ্রির চোখে চোখ রেখে তিনি বললেন, 'তোমরা এখন বড় হয়ে লেখাপড়া শিখে আমায় বেশী জ্বালাতন করছ।'

চোখ সরিয়ে নীলাদ্রি আবার একটা নিশ্বাস ফেলল।

মহিলা বললেন, 'কতদিন বারণ করেছি, হেমন্তর সঙ্গে মিশবে না। হ'ক বাবা বড়লোক। ও বখাটে ছেলে। দু-দুবার আই এ ফেল্ করল। ওর সঙ্গে মাখামাখি আমি চাই না। মন্দ ছেলের সঙ্গে প্রেম আমি খতম করবই।'

নীলাদ্রি আকাশের দিকে তাকায়।

'হেমন্তর সঙ্গে মিশলে ও উচ্ছন্নে যাবে। লেখাপড়া এখানেই শেষ। সারাটা ভবিষ্যৎ ওর অন্ধকারাচ্ছন্ন—এত বড় মেয়ে কি তা বোঝে না!' মহিলা আঁচলের খুঁট দিয়ে চোখ মোছেন। বাষ্পাচ্ছন্ন কণ্ঠস্বর। 'ফি বছর গ্রীষ্মের ছুটি হতে আলমোড়ায় ওর মাসিমার কাছে চলে যায়। এবার কিছুতেই গেল না। কত ক'রে বললাম, এই গরমে ক'লকাতায় থেকে কি হবে! একটু বাইরে বেরিয়ে এলে শরীর-মন দুই ভাল থাকে।'

'গেল না কেন?' যেন অনিচ্ছাকৃত একটা প্রশ্ন নীলাদ্রির মুখ দিয়ে বেরুল।

'ওই যে বললাম, হেমন্ত। সারাটা ছুটি ওর সঙ্গে থেকে পার্কে-ময়দানে বেড়িয়েছে, রেস্টুরেণ্টে খেয়েছে, আর সিনেমা দেখেছে। হেমন্তর তো পয়সার অভাব নেই! প্রথমটায় কি আমি টের পেয়েছিলাম! আমি জানি, অমুক ছাত্রীর বাড়ি বেড়াতে গেছে, অমুক ছাত্রীর সঙ্গে বায়স্কোপে গেল। তলে তলে যে হেমন্তর সঙ্গে—' একটু থেমে মহিলা বললেন, 'পরে হঠাৎ একদিন দিবাকর এসে আমাকে সব বলে গেল।'

কে দিবাকর, নীলাদ্রি প্রশ্ন করতে পারলে না। তার বুকের মধ্যে কাঁটাটা বড় যন্ত্রণা দিচ্ছিল।

'সেদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরতে খুব গালমন্দ করলাম, ভয় দেখালাম। কাঁদল। রাত্রে কিছু খেলে না। পরদিনও নাওয়া-খাওয়া একরকম বন্ধ।

বিকেলে কাছে ডেকে আদর ক'রে যখন চুল বেঁধে দিচ্ছি, বলল, আমি হেমন্তর সঙ্গে আর মিশব না, মা। রেডিও নেই আমাদের, একটা রেডিও কিনে দাও। এবার থেকে সারাক্ষণ বাড়িতে থাকব।'

নীলাদ্রি চমকে মহিলার মুখের দিকে তাকাল। তিনি অল্প-অল্প হাসছেন। 'মেয়ের কথা শুনে হাসিও পেল, দুঃখও হল। মনে মনে বললাম, মন্দ কি, যদি একটা রেডিও পেলে হেমন্তকে, হেমন্তর প্রেম ভুলতে পার, না-হয় তাই কিনে দেওয়া যাবে।' হাস্যবিচ্ছুরিত চোখে তিনি এবার নীলাদ্রির চোখের দিকে তাকান। 'আজকালকার ছেলেমেয়েদের প্রেমে পড়তে বেশী দেরিও লাগে না, আবার ভুলতেও এক মিনিট। ওই রুবিকে দিয়েই বুঝলাম। কি বল! তুমি বড্ড চুপ ক'রে আছ, বাবা।'

নীলাদ্রি ততক্ষণে নুয়ে হাত বাড়িয়ে একটা ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে নখ দিয়ে সেটা কুটিকুটি করছে। নীলাদ্রির কান্না পাচ্ছিল এই ভেবে, শোভনা সেনের মা কি বেঁচে নেই! আ, যদি বেঁচে থাকেন, আর কোন দিন টের পান, কলেজ পালিয়ে মেয়ে একটা লোফারের সঙ্গে বসে রেস্তোরাঁর অন্ধকারে প্রহর কাটাচ্ছে!

'সেই কখন বেরিয়েছি।' মহিলা বললেন, 'তা বাবা, টাকার তেমন জোর নেই। কর্তা বেঁচে থাকলে যা হ'ক্ তবু একটা কথা ছিল, ওঁর রেখে-যাওয়া সামান্য ক'টা টাকা ভেঙে খাচ্ছি। তার উপর ছেলেমেয়েদের জন্যে বাড়তি এটা-ওটা কিনতে গেলে প্রাণ যেন বেরিয়ে যায়। ঘুরে-ফিরে দু-তিনটে দোকান যাচাই ক'রে শেষ পর্যন্ত ওই মাঝারি দামের একটা রেডিও কিনলাম। অবশ্য রুবির ওটা অপছন্দ হবে না। কি বল?'

'হ্যাঁ, পছন্দ হবে—কেন হবে না!' নীলাদ্রি আড়চোখে ঘাসের উপর নামিয়ে-রাখা যন্ত্রটার দিকে একবার তাকাল। হাঁটুর উপর দুই হাত রেখে কুলিটা পাশে বসে ঝিমোচ্ছে। ব্যাগ থেকে রুমাল বার ক'রে মহিলা মুখ মোছেন। 'হাতের সব ক'টা টাকা খরচ হয়ে গেল। যাবার সময় ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। ফেরবার সময় আর ইচ্ছা হল না। কম পয়সায় একটা রিক্‌শ ডেকে নিলাম। আর কি, কলেজ স্ট্রীট এসে গেছি, তাই রিক্‌শও ছেড়ে দিলাম। এখান থেকে বাদুড়বাগান আর কতটুকুন রাস্তা! সনাতন সঙ্গে আছে, ভয় নেই—হেঁটেই এইবার বাড়ি পৌঁছে যাব।' মহিলা মাটিতে উপবিষ্ট লোকটিকে ডাকলেন, 'সনাতন, ওঠ্। গোলদিঘি দেখবি বলে এখানে এসে তুই ঘুমোচ্ছিস যে! রুবি শুনলে হেসে কুটিকুটি হবে।' কথা শেষ

ক'রে মহিলা নীলাদ্রির দিকে চোখ ফেরান। কুলি না, তাঁর চাকর—নীলাদ্রি এবার বুঝতে পারল।

'তুমি কোথায় থাক, বাবা?'

'টালিগঞ্জ।' নীলাদ্রি সোজা হয়ে বসল।

'অনেক দূর এখান থেকে।' মহিলা হাতের রুমাল ব্যাগে পুরলেন। 'কই রে সনাতন, ওঠ্ এবার। ক'টা বাজে এখন?'

'আড়াইটে-তিনটে হবে।' নীলাদ্রি আন্দাজে বলল।

'রুবির এইবেলা কলেজ ছুটি হবে। আজ শুক্কুরবার—তিনটে মোটে ক্লাস ওর। তুমি কলেজে যাও নি বুঝি? ছুটি? কিসের?'

'না, এমনি। শরীরটা তেমন ভাল না।' নীলাদ্রি ম্লান হাসল। তিনি উঠলেন। সনাতন ইতোমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছে, তার মাথায় রুবির নতুন-কেনা রেডিও। পাতার ফাঁক দিয়ে ঠিকরে-পড়া চিকরি-কাটা রোদের ঝালর লেগে মসৃণ কালো বার্নিশ-করা বাক্সটা ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। একটু সময় সেদিকে তাকিয়ে থেকে নীলাদ্রি একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলল। গেট পার হয়ে তারা পার্ক থেকে বেরিয়ে যায়। অদূরে ডাইভিং বোর্ডের গায়ে আর এক ঝাঁক কাক এসে উড়ে বসে সবটা সাদা অংশ ঢেকে ফেলেছে।

সূর্যমুখী

আমরা সাতজন ছিলাম এক বাড়িতে। এক আকাশে যেমন সাতটি তারা ফোটে সন্ধ্যাবেলা, তেমনি সন্ধ্যা থেকে এক ঘরে আমরা জড়ো হয়েছি সারা দিনের ছুটোছুটির পর। সাত-তাড়াতাড়ি ক'রে আমরা ছুটে এসেছি একসঙ্গে বসে গল্প করব বলে, মুখোমুখি হয়ে বসে, গায়ে গা লাগিয়ে, কি গালে গাল ঠেকিয়ে। আমি, রত্না, রেবা, রাণু, নিশা, কুমকুম আর কেতকী। সাতজন। একজন আর একজনকে ছেড়ে থাকতে পারি নি।

আমরা সাতটি মেয়ে কি ক'রে এক জায়গায় এসেছিলাম, তাই ভাবি।

রাণু, রেবা, রত্না আসে নি। ওরা এখানেই ছিল। এ-ই ওদের বাড়ি। ওরা কাকাবাবুর মেয়ে। আর, ওদের জেঠতুতো বোন হয়ে আমরা এসেছিলাম আশ্রয় নিতে বাবা মরবার পর। বাবা মরলেই মেয়েরা নিরাশ্রয় হয় বেশী। মা মরেছিল আমাদের সেই ছোটবেলা।

তারপর এসেছে নিশা আর কুমকুম।

আমাদের চেয়েও ওরা গরিব। ওদের বাপ ছিল উকিলের মুহুরি। মফস্বলের সরল চেহারার দুই বোন ময়লা শাড়ি আর সেমিজ পরে যেদিন সন্ধ্যার সময় এ বাড়ি এল আশ্রিতা হিসাবে, সেদিন আমার আর কেতকীর ভয় হয়েছিল। এবার বুঝি কাকাবাবু বিরক্ত হবেন, কাকিমা মুখ ভার করবেন, রেবা-রত্না-রাণু রাগ ক'রে কথা বলবে না কারওর সঙ্গে। ওদের মামাতো বোন আবার হঠাৎ এসে ভিড় করবে এই ছোট বাড়িতে, ওরা কি জানত!

কিন্তু দেখলাম, ওরা যেন অপেক্ষা করছিল। আমাদের ছাড়া আরও দুটি এখানে এসে উঠবে, ওরা ধরে রেখেছিল। রাণু, রেবা, রত্না। আমায় আর কেতকীকে যেমন হাতে ধরে টেনে নিয়েছিল ওদের ঘরে, তেমনি আনন্দ-অভ্যর্থনা পেল নিশা ও কুমকুম। ত্রুটি ছিল না।

আর, আমরা তখনই হাল্‌কা হয়ে গেলুম। কেতকী ও আমি।

কেননা, কাকাবাবুর মুখ ভার দেখলাম না, কাকিমার হাসিখুশি চোখ এক সেকেণ্ডের জন্তে অন্ধকার হয় নি।

দুজন বলাবলি করল—উপায় কি, শাকভাত যদি আমরা খাই, ওরাও খাবে—হরিহরের (নিশা ও কুমকুমের বাবা) মেয়েও তো আর পর নয়! 'কিন্তু মানুষ কেন এমন স্বল্পায়ু হয়!' বলে কাকাবাবু সাধারণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেছিলেন্ তখন। তারপর সহজভাবে মেনে নিলেন। ওরা তাঁর রত্না, রাসু ও রেবার মত এ বাড়িরই মেয়ে। কেতকী ও আমার মত।

আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের সাতটি মেয়ে হল কাকাবাবুর সংসারে।

তিনি বিত্তবান ও বিদ্বান।

এলগিন রোডের নাম-করা লোক।

ব্যবসা ক'রে পয়সা জমিয়েছেন। মাথার চুল সবে পাকতে আরম্ভ করছিল। কিন্তু আমরা যখন ও বাড়িতে গেছি, তখন আর তিনি ব্যবসা করেন না। তখন তাঁর অবসর। ব্যবসার বিরামহীন অর্থসমাগমের পরে অর্থের উপর একদিন মানুষের অরুচি আসে শুনেছি, কেউ ধর্মকর্ম করেন, অকাতরে কেউ অর্থ বিলিয়ে দেন অতিথিশালায়, হাসপাতালে, প্রসূতিসদনে। আর কেউ কেবল দু হাতে খরচ করেন—আত্মসুখ বা পরিজনের সুখে যতক্ষণে না নিঃশেষে সব উজাড় হয়ে যায়।

কিন্তু সেই উজাড় ক'রে দেওয়ার বিরোধী কাকাবাবু, প্রথম দিন দেখেই আমার মনে হল। আমার মন বলল, প্রভূত অর্থের চাপেও রুচিকে তিনি অসুস্থ হতে দেন নি—সুরুচির পূজারী তিনি। তাঁর দেওয়াল-ঘেরা পাথর-বসানো সুন্দর বাড়ির চারদিক তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে গেলাম।

বাড়ির পিছনে জামরুলের ছায়া আর ঘাসবন আর ঝাউএর সারি। আর সামনে, প্রায় সবটা লন্ জুড়ে, গ্যারেজ থেকে শুরু ক'রে গেট পর্যন্ত রাশি রাশি সূর্যমুখী। সূর্যমুখীর ঢেউ-খেলানো নিবিড়-হলুদ অরণ্য। নির্বাক হয়ে দেখছিলাম প্রথম দিনই। কাকাবাবু কাস্তে হাতে উঠে এসেছিলেন বাগান থেকে—তাঁর হাতে মাটি, হাঁটু অবধি দু পায়ে মাটি। খালি খোলা গা।

সেদিনও তাই দেখলুম। নিশা আর কুমকুম যেদিন এল।

হাসলেন। একটু গম্ভীর হলেন পিতৃহীনা আরও দুটি অনাথাকে দেখে। হরিহরের জন্যে একটু শোক করলেন, তারপর আবার ফিরে গেলেন বাগানে। যেন আর তাঁর কথা নেই। এখানে যে ওরা এসে গেছে, এতেই উনি তৃপ্ত। আর কিছু বলার ছিল না।

সত্যি, সারা দিন খুটখুট ক'রে বাগানের তদারক করা ছাড়া কাকাবাবুকে ক'দিন কতক্ষণ বাড়ির ভিতরে দেখেছি!

[illegible]ও খুব বেশী আমাদের মধ্যে দেখতুম না।

যেন ওঁরা স্বামী-স্ত্রী সাজানো সোনার সংসার আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন ক'রে আছেন।

এই চেয়েছিলেন তাঁরা। এই তাঁদের বার্ধক্যের, বিদায়ী বিষণ্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষিত বিশ্রাম।

কাকিমা তাঁর ঘরে বসে চুপচাপ উল্‌ বুনতেন। কাকাবাবু সূর্যমুখীর গুঁড়িতে মাটি দিতেন, আর আমরা সারা দিন পাখির মত কিচিরমিচির ক'রে বাড়ি মুখর করেছি।

বাড়িতে আমরা ছাড়া আর কেই বা ছিল!

সাতটি মেয়ে। কাকাবাবু ছাড়া দ্বিতীয় পুরুষ ছিল না।

বাথরুমের দরজায়, খাবার-ঘরে, ছাদে, বারান্দায়, সিঁড়িতে—সর্বত্র আমরা ছড়িয়ে থাকতুম। আর গল্প। রেবার হাতে হাত ঠেকিয়ে আমি, কুমকুমের কনুইএর সঙ্গে কনুই লাগিয়ে রাহু। কেতকী, নিশা আর রম্ভা ঘেঁসাঘেসি হয়ে বসে সারাক্ষণ কাটাত।

এই বয়সের এতগুলি মেয়ে এক জায়গায় এসে ছত্রখান হয়ে থাকতে পারে না। একটি স্তবকের মত, ফুলের একটি গুচ্ছের মত আমরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরেছিলাম। ফুলের গায়ের বসন্তের মত আমাদের গায়ে বসন্ত এসেছিল।

না, এখানে এসে আমার-তোমার বলতে স্বতন্ত্র কিছু ছিল না। একটি বড় ট্যাল্‌কমের কৌটো থেকে পাউডার ঢেলে আমরা মুখে মেখেছি, একটি পাফ ঘুরে ঘুরে গেছে এ গাল থেকে ও গালে। কার শাড়ি কখন কার গায়ে উঠত, কার জুতো কে পায়ে দিয়েছি, আমাদের খেয়াল থাকত না।

কেননা, আমরা আলাদা ক'রে কেউ কাউকে দেখি নি।

রাহুর গায়ের রং ছিল গোলাপের মত সুন্দর, আর নিশা ছিল রাত্রির মত কালো। উল্লেখযোগ্য গায়ের রং রেবার কি আমারও ছিল না। আমাদের দুজনের চোখ ছিল ভাল। আর কেতকী ও কুমকুমের ছিল পায়ের গোড়ালি অবধি ছড়িয়ে-পড়া আশ্চর্য অফুরন্ত চুল। মেঘের মত কালো, রাত্রির মত গভীর চুল দেখে আমাদের ঈর্ষা হত কি? না রম্ভার পাখির ঠোঁটের মত সুছাঁদ চিকন বাঁকানো নাক দেখে কেতকী ও কুমকুম হিংসা করেছে কোনদিন?

হিংসা আমরা কেউ কাউকে করতে পারি নি, কি ঈর্ষা।

এর চুল, তার চোখ, ওঁর রং বা আর একজনের নাক অথবা এমন যে কালো নিশা, তারও পলাশফুলের মত চওড়া, উদ্ধত, বিস্ফারিত দুই ভুরুর দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেছি। একজন আর একজনকে এমনভাবে কাছে টেনেছি, উপভোগ করেছি। পরস্পরের উদ্ভিন্ন যৌবনের রূপকে আমরা বন্দনা করতে পারব বলে ঈশ্বর আমাদের এক জায়গায় জড়ো করেছেন, ভাবতাম এক-একসময়। আঠারো থেকে বাইশ বছর বয়সের আর সাতটি মেয়ে একসঙ্গে এত সুখে ছিল কিনা, জানি না।

আমাদের সাথী আমরাই ছিলাম। রেবা, রত্না কলেজ যাওয়া ছেড়ে দিল আমাদের পেয়ে। এলগিন রোডের বাড়িতে সাতটি তারার মেলা বসল।

সত্যি, কি অদ্ভুত নেশা লাগে এ বয়সে এ বয়সের আর একটি মেয়ের সঙ্গে বসে গল্প করতে! সাতজন সাতজনের গল্প কান পেতে শুনেছি দুপুরে, রাত্রে, সকালে ও সন্ধ্যায়। সন্ধ্যাবেলা বাড়ির পিছনে জামরুল আর ঝাউএর ছায়ারা যখন এক হয়ে হয়ে ঘনতর হত, অন্ধকার নামত ঝাউ আর জামরুল বনে, তখন আমরা আরও ঘন হয়ে দাঁড়াতুম। একজন আর একজনের কাছে। শরীরে শরীর ঠেকিয়ে আলোর নিচে গোল হয়ে বসে আমাদের গল্প চলত কত রাত্রি অবধি। ঘাসপোকারা তখন ঘাসবন থেকে উড়ে এসে আমাদের জানলার কাঁচে মাথা ঠুকত কিনা, মনে নেই; কেননা, তখন জানলার দিকে চোখ থাকত না আমাদের, পরস্পরের মুখের দিকে চেয়ে থাকতুম, সাতজনের চোখের আয়নায় পড়ত সাতটি মুখের ছায়া।

আমাদের ঘর ছিল বাড়ির শেষ প্রান্তে। ওটাই নাকি দক্ষিণ দিক। কিন্তু কেন জানি মনে হত, বাড়ির সবটা দিকই বুঝি দক্ষিণ। এমন হুহু হাওয়া আসত চারিদিক থেকে।

স্প্রিংএর খাটে কমলা রঙের কাশ্মীরী সুজনি-বিছানো সাতটি বিছানা। কে জানে, আমরা সাতজন এখানে থাকব বলে কাকাবাবু একরকমের সাতটি খাট ও একরঙা সাতটি সুজনি আগে থেকে যোগাড় ক'রে রেখেছিলেন কিনা, অনেক দিন ভেবেছি।

ভোর হতে কাকিমাও সবুজ ঢেউ-খেলানো জমির উপর জাফরানী চিকুরি-কাটা একরকমের সাতটি কাপে ক'রেই আমাদের চা পাঠিয়ে দিয়েছেন।

চায়ের বাটি হাতে নিয়ে তখনই বসে গেছি গোল হয়ে মেঝেয়, কার্পেটের উপর, সদ্য-ঘুমভাঙা ফোলা-ফোলা চোখ নিয়ে। কেননা, আমরা জানতুম, ঘুম থেকে জেগে প্রথম চোখ মেলেই জানতুম, আবার একটি সুন্দর দিন

আরম্ভ হল। আমরা কেবল গল্প করব আর চুপচাপ বসে থাকব হাতে হাত ঠেকিয়ে, আর গল্পের ফাঁকে ফাঁকে ঝাউএর চকিত মর্মর শুনব আর ভাবব, সত্যি আমরা কত সুখী এখানে!

বসে থাকা ছাড়া কিছু করবার ছিল না সারা দিন, কিছু ভাববার। আমাদের জন্যে তিনটি চাকরানী রেখে দিয়েছিলেন কাকাবাবু।

রাম্নু, রেবা ও রত্না থেকে আমরা অভিন্ন ছিলাম না বলে রাম্নু, রেবা ও রত্নার জন্যে ভাগ ভাগ ক'রে সাজিয়ে-রাখা অপুত্রক অর্থশালী বাপের সমস্ত আদর, যত্ন, সুখ ও পরিচর্যায় আমরা ভাগ বসাতে এসেছি ভেবে মাঝে মাঝে লজ্জিতও হয়েছি; তারপর ভুলে গেছি সে কথা। যেন, ভুলে না যাওয়া অপরাধ ছিল ও বাড়িতে। এমন ব্যবহার পেয়েছিলাম কাকিমা, কাকাবাবু আর তাঁদের তিনটি মেয়ের কাছে।

আমি আর কেতকী এসেছিলাম আশ্বিন মাসে। কাকাবাবুর বাগানে সূর্যমুখীদের তখন নতুন যৌবন। শরতের রোদ ম্লান হয়ে গেছল বাগানের হলদে বর্ণসুষমায়। অবাক হয়ে ভাবতুম, এত ফুল কি ক'রে ফোটাতে পারলেন কাকাবাবু একহাতে। এত টাকা কি ক'রে তিনি জমিয়েছেন এক জীবনে, সে কথা কিন্তু মনে হয় নি বেশী।

নিশা আর কুমকুম যখন এল, তখন শীতের মাঝামাঝি। স্বল্পায়ু রোদের দিকে চোখ মেলে সূর্যমুখীরা তখনও বেঁচে ছিল।

গ্রীষ্মকালে বাগান শুকিয়ে গেল। সমস্ত বাগান।

আমরা সাতজন রেলিংএর এপার থেকে মৃত সূর্যমুখীদের শুকনো কালো পাপড়ি-খসা দেখলাম।

কাকাবাবু বাগান পরিষ্কার ক'রে ফেললেন। আগাছার মত সব শুকনো ডাঁটা মূল সুদ্ধ টেনে টেনে তুলে জঞ্জাল-ফেলার পাত্রে জড়ো ক'রে রাখলেন। তারপর একদিন পাইপ ধরাবার দেশলাইএর কাঠিটা জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিলেন আবর্জনায়।

তারপর তাঁর নতুন বাগান তৈরি আরম্ভ হল। রেবা, রত্না, রাম্নুর পিছনে দাঁড়িয়ে আমরা যারা নতুন এ বাড়ি এসেছি, এই প্রথম সূর্যমুখীর চাষ দেখলাম —এ বছরের।

আষাঢ় মাস। আকাশ কালো হয়ে উঠছে এখন-তখন। ঝাউএর মাথা অন্ধকার ক'রে দিয়ে বৃষ্টি নামল জোরে।

আমাদের আনন্দের মাত্রা আরও বেড়ে গেল।

ঘরে বসে গল্প করার পালা এবার ফুরিয়েছে। এখন ছুটে এস বাইরে। যেন সূর্যমুখীহীন খোলা মাঠের ডাক শুনে আমরা সাতজন সেদিন দুপুরবেলা হাত ধরাধরি ক'রে নেমে পড়লাম বাগানে। ঝুপঝাপ।

এমন উত্তেজিত হয়ে উঠেছিলাম যে, নরম ঘাস পার হয়ে নরম মাটির কাছাকাছি চলে গেছলাম। যেখানে কাকাবাবু বীজ পুঁতে রেখেছেন। কাঠি পুঁতে দিয়েছেন। এক-একটি কাঠি আশ্রয় ক'রে অঙ্কুরগুলি বড় হবে, মাথা তুলবে, আর একদিন সূর্যমুখী হয়ে পৃথিবীকে চম্‌কে দেবে।

কানের দু দিকে বেণী ঝুলিয়ে অর্ধেকটা শরীর বাঁকা ক'রে ক'রে সাতজন মাটির নিচের ঘুমন্ত সূর্যমুখীদের দেখলাম। ঘুরে-ফিরে। এ ওর হাত ধরে।

মাথার উপর দিয়ে সাতটি পায়রা উড়ে গেল। বর্ষণ থেমেছে। হাওয়া দিয়েছে জোরে। হাওয়ায় উড়িয়ে-নেওয়া ছেঁড়া মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে আমাদের সাত জোড়া চোখ আর আকাশ পর্যন্ত গেল না। মাটিতে আট্‌কা পড়ল।

মেঘরঙের এক বিরাট হাওয়াগাড়ি লন্‌-এ ঢুকে আমাদের প্রদক্ষিণ করছে নিঃশব্দ সরীসৃপের মত। ভয় লাগল গাড়ির চেহারা দেখে। স্তম্ভিত হয়ে গেলাম, সংকুচিত হয়ে পড়লাম সব।

সত্যি, এক পা এগোবার ক্ষমতা ছিল না তখন আমাদের কারওর কোন দিকে। হাত ধরাধরি ক'রে, তাড়া-খাওয়া হরিণীর মত, সাতটি কুমারী ছুটে এসেছি ঘরে।

আমরা প্রস্তুত ছিলাম কি এর জন্যে! বাদ্‌লা দিন বলে সেদিন স্নান করি নি, চুল বাঁধি নি, কাপড় বদ্‌লানো হয় নি কারওর।

আমরা কি জানতুম! আমরা জানতাম না।

আমরা জানলাম কাকাবাবুর সাদর সম্ভাষণে, কাকিমার আনন্দ-অভ্যর্থনায়। বাঞ্ছিত পুরুষ। অনধিকারী কেউ গাড়ি নিয়ে ভিতরে এসেছে আজ পর্যন্ত এ বাড়ি, না আসতে পারে কখনও! না এমনভাবে গাড়ি নিয়ে সারা মাঠে চক্কর দিয়ে মেয়েদের দেখবে!

মেয়েদের দেখার দৃশ্যটা আমাদের চোখে ভাসছিল তখন। জানলার বাইরে বাড়িয়ে-দেওয়া কালো চশমা-পরা চোখের ব্যগ্র ব্যস্ত চঞ্চল চাহনিতে।

মেয়েদের দেখার এক ধরনের ব্যস্ততার পিছনে কি আছে, মেয়েরা টের পায়। আমরা সর্বাঙ্গ দিয়ে তা অনুভব করছিলুম।

কুমকুম ছিল না কপালে, কাজল ছিল না চোখে। দুঃখ সেজন্য নয়। সত্যিই, আমরা কাকাবাবুকে ঘুমন্ত দেখে ভারি আটপৌরে বেশে দুপুরবেলায় বাগানে গেছলাম। সাধারণ বডিজ ছাড়া আমাদের গায়ে কিছু ছিল না।

কিন্তু বাঞ্ছিত পুরুষটির কি উচিত ছিল না গাড়ি দাঁড় করিয়ে নেমে সোজা বারান্দায় উঠে আসা বা গাড়িতেই চুপচাপ বসে থাকা? মুখ কালো ক'রে গুম হয়ে যার যার খাটে বসে রইলাম। আর চাকরানীরা মুহুর্মুহু রোমাঞ্চকর সব বার্তা বয়ে আনতে লাগল আমাদের ঘরে।

আশ্চর্য মেয়েদের মন, চাকরানীদের মুখের সেই টুক্‌রো টুক্‌রো সংবাদের উপর অরুচি ছিল না কারওর। পরিষ্কার দেখলাম, নিশা চুপিচুপি আয়নায় নিজের ভুরু দেখছে, রান্থ দেখছে তার গায়ের রং। আমার চোখ দুটি যে দেখতে ভাল, সে সম্বন্ধে আমি হঠাৎ অতিমাত্রায় সচেতন হয়ে উঠলাম।

সংসারে এমন কে কুমারী আছে, যে বিশেষ এক মুহূর্তে তার ফুলের মত চুল, কি ধনুকের মত ভুরু বা সুন্দর চোখ, কি ঠোঁট বা নাকের জন্যে একটু বেশী-রকম উল্লসিত, উত্তেজিত হয়ে ওঠে না?

আমাদেরও তাই হয়েছিল।

কতক্ষণ আমরা কেউ কারও মুখের দিকে তাকাই নি। আমার চেয়ে ওরা কোন্ দিক দিয়ে বেশী সুন্দর, ভাবছিলাম হয়তো সবাই।

ছোট চাকরানী জল খাবার রুপোর থালা-গ্লাস নিতে এসে বলে গেল, মেয়ে বাছতে এসেছে বুঝি, কনে দেখতে, তৈরী হয়ে থাকুন দিদিমণিরা।

মেজো চাকরানী বলে গেল, টালিগঞ্জে পাঁচখানা বাড়ি আছে. আরও দুখানার জন্যে জমি কেনা হয়েছে। টাকার কুমির।

আমরা ঘেমে উঠলাম। আড়চোখে একবার এ ওর মুখের দিকে তাকালাম।

বলতে কি, মেদস্ফীত, স্থূলচর্ম, ভীষণদর্শন সেই গগলস-পরা চেহারাও আমাদের কাছে, আমাদের মনের চোখে তখন যেন আর তত খারাপ ঠেকছিল না।

নিশার অমাবস্যার মত কালো রং আমাদের কারও কারও চোখে হঠাৎ ভাল লাগল। রত্নার মোটা থুঁতনি, কেতকীর কটা চক্ষু, রেবার বেঁটে ঘাড় আমাদের অনেকেরই যেন ঈর্ষার বস্তু হয়ে দাঁড়াল। ওদের ওই দিয়ে হয়তো ওরা সুন্দর।

সংসারে কার কি পছন্দ, কেউ কি জানে!

আমরা অদ্ভুতভাবে চুপ ক'রে রইলাম।

লালসাঙ্করিত কদর্য চাহনিও মেয়েদের অস্থির ক'রে তোলে, ঈর্ষান্বিত।

যখন বোঝা যায় না, অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত থেকে যায়, গুচ্ছের মেয়ের মধ্যে ঠিক কার গায়ে এসে বিঁধল কামনার অঙ্কুশ।

কুৎসিতকে নিয়েও পৃথিবীতে মেয়েরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। ভয়ানক কাণ্ড ঘটিয়েছে। কথাটা মনে পড়তে প্রত্যেকেই একটি ক'রে দীর্ঘশ্বাস ফেললাম।

আর, সোজা হয়ে বসে রইলাম, দাসী আবার কি বার্তা বয়ে আনে। আর, কার ডাক আগে আসে, তাও ভাবছি।

আর, আড়চোখে তাকিয়ে দেখছিলাম, রান্থ, রেবা, রত্না কি করে। ওরা উঠল না, চুল বাঁধল না। স্থির হয়ে বসে আছে। আমরাই বা তবে উঠি কি ক'রে! ওরা তিনজন এ বাড়ির। আমরা এসেছি পরে। আমি ও কেতকী। তারপরে নিশা ও কুমকুম। আমাদের দাবি পিছনে।

জানলার বাইরে জামরুলের কালো ডালে একটা কাক বসে আছে। লাল গোল চোখ পাকিয়ে আমাদের বারবার দেখছে তখন। সাতজনের মধ্যে কোন্‌টি সৌভাগ্যবতী, এই কি ভাবছিল দুষ্টু কাক!

একটা লম্বা হাসির শব্দ শুনলাম ও দিকের বারান্দায়। যেন ভারি একটা ড্রাম সিঁড়ি দিয়ে নিচে গড়িয়ে পড়ল। আশ্চর্য, এই হাসিও আমাদের কানে সুধার মত ঠেকল।

বড় চাকরানী এসে বলল, জলখাবার খাওয়া হয়েছে, এইবেলা বুঝি দিদি-মণিদের ডাক পড়বে। যেন সাতজনই তখন উঠে পড়তুম সাজগোজ করতে। সাতজনের বুকের ভিতর কাঁপছিল আশায়, আশঙ্কায়, ভয়ে, উল্লাসে।

মেজো চাকরানী এল অন্যরকম সংবাদ নিয়ে, আজ বুঝি আর দেখবে না, বিষ্যুতের বারবেলা যে, উঠে গেল।

আমরা কান পেতে রইলাম। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ হল। গাড়ির আওয়াজ শুনলাম বাইরে। আস্তে আস্তে শব্দ মিলিয়ে গেল রাস্তায়।

ছোট চাকরানী এল মুখ কালো ক'রে। বলল, ঘাড়ের সব চুল পেকে গেছে, তাতেই বুঝি কর্তাবাবু গররাজি হলেন শেষটায়।

ও মা, বলিস কি! বড় দাসী মুখ ঘোরাল। সাতখানা বাড়ি যার, তার চুল সাদা কি কালো, দেখতে আছে নাকি! কচি কচি আঙুল দিয়ে ক' গাছা পাকা চুল তুলে ফেলতে কতক্ষণ লাগত! মেজো দাসী আমাদের কচি আঙুলগুলির দিকে তাকাল।

বুঝলাম, আমাদের বুঝতে আর এক সেকেণ্ড দেরি হল না, কাকাবাবুই শেষ পর্যন্ত পিছিয়ে গেছেন। তাই কি?

সবটা বাড়ি কেমন নিঝুম হয়ে আছে।

এমন বাঞ্ছিত পুরুষ একটু বেশী বয়সের দরুন বাতিল হয়ে গেল, বলতে কি, দাসীদের আফসোস আমাদের বুকেই যেন বিঁধল বেশী।

আজ ভাবি, কেন নির্লজ্জের মত সেদিন এমন অস্থির হয়ে পড়েছিলাম আমরা, এত উতলা। আমাদের সাতজনের একজনও যে আর আলাদা হব না, ছাড়াছাড়ি হওয়ার ভয় কেটে গেছে আগন্তুকের তিরোধানের সঙ্গে সঙ্গে—এই আনন্দ, এই সন্তোষ নিয়েই কি হাত ধরাধরি ক'রে তখনই আমাদের উচিত ছিল না কার্পেটের উপর গোল হয়ে বসে আবার গল্পের আসর জমানো!

কিন্তু কেউ উঠি নি। কেউ কারওর মুখের দিকে তাকাচ্ছি না পর্যন্ত। তখনও। যেন কি হয়ে গেছে আমাদের মাঝখানে।

একটি শর অযাচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে এসে একটি ফুলের তোড়াকে ছিন্ন-ভিন্ন ক'রে দিয়ে গেল যেন, ভাবলাম সব বসে বসে।

ভুল ভাঙ্গল বিকেলে। রীতিমত রোদ উঠেছে তখন। ঝাউএর মাথা চিকচিক করছে। সবুজ মখমলের মত হয়ে আছে বৃষ্টিধোয়া ঘাস।

সাতজনকে সামনের বারান্দায় ডেকে নিয়ে কাকিমা সোনালী লতাপাতা-আঁকা সাতটি সুন্দর প্লেটে ক'রে আনারস খেতে দিলেন।

কাকিমা উল বুনছেন। কাকাবাবু পাশে দাঁড়িয়ে।

'সাতজনের একজনকেও ওর পছন্দ হল না?' উল থেকে মুখ না তুলে কাকিমা প্রশ্ন করলেন।

একটু সময় চুপ থেকে কাকাবাবু বললেন, 'ভাবছি, কুমিল্লা থেকে ডলি-মিলি দু বোনকে এখানে এনে রাখব—ওরাও তো একরকম নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছে।'

ঈষৎ মাথা নেড়ে কাকিমা বললেন, 'তাই রেখো।'

'তাই করতে হবে আমাকে।' ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেললেন কাকাবাবু। 'ওর সাতখানা কি ন'খানা বাড়ি, তা তো আমার লক্ষ্য নয়—ওর এত বড় চামড়ার ব্যবসায় বখরা না বসানো পর্যন্ত আমি স্বস্তি পাব না।'

'এই বয়সেও তোমার ব্যবসার ঝোঁক কমে নি!' অল্প হেসে কাকিমা মুখ তুললেন। কোন কথা না বলে হাত বাড়িয়ে কাস্তেখানা তুলে নিয়ে কাকাবাবু আস্তে আস্তে বাগানে নেমে গেলেন। বুঝি ওধারে কিছু আগাছা গজিয়েছে, সূর্যমুখীর বেড়ার ধারে।

আমরা, আমরা সাতটি কুমারী, ফল খাওয়া শেষ ক'রে হাত ধরাধরি ক'রে চলে এলাম ঘরে।

ইস্ত্রি

'কুন্তলা ক্লিনিং'।

বেশ নাম। ডাইং ক্লিনিংএর এমন সুন্দর নাম কেউ কোন দিন শুনেছে?

অসিতের বৈঠকখানার দরজায় প্রকাণ্ড সাইন বোর্ড চোখে পড়ল সবাইএর।

হ্যাঁ, অসিতবরন গ্র্যাজুয়েট। কুন্তলা আই এ পাস।

বেশ তো, শিক্ষিত ছেলে, ভদ্রলোকের ছেলে স্ত্রীর নামে লন্ড্রি খুলেছে, বেশ করেছে। সৎ সাহস, সহজ বুদ্ধির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

এ বিষয়ে কুন্তলার উৎসাহ বেশী। তাই বল।

বুদ্ধিমতী মেয়ে। ফার্ন রোডের প্রবীণের দল মাথা নেড়ে বলল, 'চাকরি ক'রে অসিত করত কি? চাকরি হারিয়ে ব্যবসার দিকে ঝুঁকেছে, ভাল করেছে। অল্প পুঁজিতে চমৎকার ব্যবসা। তা ছাড়া—'

তা ছাড়া অসিত যে আর একটা চাকরি পেত, তারই বা নিশ্চয়তা ছিল কত! অনেক পুঁজি ভাঙ্গতে হত, অনেক কাঠখড় পোড়াতে হত। তার চেয়ে—

সামান্য পুঁজিতে তাড়াতাড়ি এই শিক্ষিত বাঙালী-দম্পতি একটা ব্যবসা দাঁড় করিয়েছে, এটাই সবচেয়ে বড় কথা। এ থেকে শেখবার আছে আমাদের ছেলেমেয়ের।

নিশ্চয়ই, কুন্তলার উৎসাহ বেশী।

রীতিমত পাড়ার মান্যগণ্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ডেকে উদ্‌বোধন করা হয়েছে এই লন্ড্রি। কুন্তলা নিজে গিয়ে সবাইকে নিমন্ত্রণ করেছিল। ফ্যাশনেবল পাড়া। একটু জাঁকজমক চাই, চাকচিক্য।

ফার্ন রোডের ঠিক উপরেই কুন্তলাদের বৈঠকখানা। দরজার এক দিকে একটা কৃষ্ণচূড়া গাছ, অন্য দিকে দুটো ইউক্যালিপটাসের চারা—তারের জাল দিয়ে ঘেরা। সামনেই ঘরের ঠিক বিপরীত দিকে বিজলীবাতির থাম। আর, তার গা ঘেঁসে বেরিয়ে গেছে নতুন আর একটা রাস্তা।

অর্থাৎ দোকান দেবার মত অসিতের ঘরখানা বটে। ডাইং ক্লিনিং, ভালই তো। বেশ চলেছে।

ভদ্রপাড়ায় ভদ্রভাবে কাপড় ধোয়াবার একটা জায়গা হয়েছে।

আলোকোজ্জ্বল সুন্দর সাইন বোর্ডের দিকে একটুক্ষণ চেয়ে থেকে বুড়োরা দীর্ঘশ্বাস ফেলে পরে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে চলে যায় পার্কের দিকে।

'কুন্তলা ক্লিনিং' ছেলেদের আগে টানল।

ফার্ন রোডের সব যুবক। তাদের কলেজ আছে, পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ক্লাস, অফিস, সিনেমা, খেলার মাঠ, বন্ধুর বাড়ি নিমন্ত্রণ। কি বান্ধবীর কাছে যাওয়া। আর্জেণ্ট। এক দিনে সব চাই। দেরি হলে মুশকিল।

শার্ট, পাঞ্জাবি, ধুতি, ইজার, টাই, ট্রাউজার, কোট, পেণ্টুলন। না, ইস্ত্রি কম হলে চলবে না। পাঁপড়ের মত করকরে হওয়া চাই, কাগজের মত ফুরফুরে। পর্যন্ত রুমালটি।

তারপর এল মেয়েরা। দল বেঁধে। প্রথম দিন যদি এল তিনজন, দ্বিতীয় দিন এল তেরজন।

পাড়ার মধ্যে দোকান।

জানাশোনা লোক অসিতবাবু। শেষ পর্যন্ত মেয়েরাই ভিড় করল বেশী।

নিঃসংকোচে সবাই লনড্রির কাউণ্টারের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। শাড়ি, শায়া, বডিজ, ব্লাউজ। হ্যাঁ, ওদের বালিশের অড়, সুজনি, জানলার পরদা, নিজেদের হাতের কাজ-করা ফুল-তোলা টেবিল-ঢাকনিটি পর্যন্ত ধোয়াতে নিয়ে এল। ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারল অসিতের বুকের কাছে। আর মৌসুমী ফুলের মত রকমারি রঙের অসংখ্য অগুণতি রুমাল। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের রুমালের সংখ্যা বেশী। অনেক বেশী।

'রঙের দিকে নজর রাখবেন।' বলল ওরা, 'রং যেন নষ্ট না হয়।'

হেসে অসিত ঘাড় নাড়ে।

'রঙের জন্যেই আপনার কাছে এলাম, বুঝলেন না। এই সুরাটীর রং গেলে আমার সর্বস্ব গেল।'

'আমার মারাঠীর পাড় যেন জ্বলে না যায়। জরির সোনা কেমন আগুনের মত জ্বলছে, দেখুন। ধুয়ে এলে এমনটি থাকবে তো ?'

'থাকবে।' অসিত চোখ বুজে মাথা নাড়ে।

'অর্গ্যাণ্ডি। খেয়াল রাখবেন।'

'রাখব।'

'পপলিন।'

'হুঁ।'

তারপরও আসে চোলিপিস্, সিল্ক, ক্রেপ, ভয়েল, মল্‌মল, রেয়ন। রুমালের চেয়েও ব্লাউজের সংখ্যা বেশী কি?

'পাঠিয়ে দেব, আরও নিয়ে আসব।' ঘাড় বেঁকিয়ে, বেণী দুলিয়ে বলে মেয়েরা। 'এর মধ্যেই ময়লা হয়ে আছে আরও তিনখানা।'

'আনবেন, দেবেন পাঠিয়ে।' কৃতার্থের হাসি অসিতের চোখে। অসিতের গলায় পাউডার, মুখে স্নো, চাঁছা ঘাড়। গায়ে সদ্য পাট-ভাঙ্গা গরদ।

মাথা নিচু ক'রে মেমো লেখে।

মেয়েরা সামনে অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে কাউণ্টার ধরে দাঁড়িয়ে।

অসিতের পেছনে দুটো আলমারি। কাপড় ধুয়ে এলে ভাঁজ-ভাঁজ ক'রে খবরের কাগজে জড়িয়ে নম্বর দিয়ে সেগুলো আলমারিতে রাখা হয়।

দুই আলমারির মাঝখানে ঝুলছে ডোরাকাটা পরদা। অন্দরে যাবার পথ।

পরদার পিছনে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে কুন্তলা। রুদ্ধশ্বাস হয়ে শোনে মেয়েদের সঙ্গে মালিকের কথাবার্তা।

মালিকানা-স্বত্ব কুন্তলারই বেশী এই লন্ড্রির।

হাতের এক জোড়া কাঁকন খুলে দিয়েছিল সে, যখন ডাইং ক্লিনিং খোলা হয়।

সেই টাকায় আলমারি দুটো কেনা হয়েছে।

প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের যে ক'টা টাকা বাকি ছিল নিঃশেষ হবার, সেই টাকায় অসিত সাইন বোর্ড করিয়েছে শুধু।

পিতলের রড লাগানো সেগুন কাঠের কাউণ্টারটা কেনা হয়েছে ধারে। আর, লন্ড্রির যেটা সবচেয়ে বেশী দরকারী—একটা ইস্ত্রি ও ইলেকট্রিক স্টোভ।

তা ছাড়া টুকিটাকি জিনিস। যেমন—সিঁড়ির জন্যে দুটো জিনিয়ার টব, ক্যাশ মেমো ছাপানো খরচ, একশ' পাওআরের দুটো বাল্‌ব, দু দোয়াত মার্কিং ইঙ্ক, ঝাড়ন ইত্যাদি কুন্তলা করেছে। ক'টা টাকা তার হাতে ছিল বাবার কাছ থেকে পাওয়া, সেই বিয়ের আগে। বিয়ে করার সঙ্গে সঙ্গেই যে অসিতবরন বেকার হবে, কে জানত!

ভাবে সময় সময় কুন্তলা।

কিন্তু কথা সেটা নয়।

অসিতের চাকরি যাওয়ার পর, পর মানে ঠিক তখনই, কুন্তলা চাকরির অফার পেয়েছিল। হ্যাঁ, সিভিল সাপ্লাইএ। তার মামাবাবু তাকে কথা দিয়েছিলেন চিঠি পেয়েই।

স্বামী দেয় নি। অসিতবরন বেশ হাসতে হাসতে বলেছিল, 'তুমি চাকরি করবে কোন্ দুঃখে! এখনই চাকরি করতে তোমায় আমি দেব কেন!'

নিজের পৌরুষের উপর পূর্ণ আস্থা রেখে অসিত কুন্তলাকে নিবৃত্ত করেছিল।

কুন্তলাও দ্বিতীয়বার এ কথা উত্থাপন করে নি।

কেননা, বাইরে চাকরি করতে যাওয়ার ইচ্ছাটা স্ত্রীরা যত বেশী গোপন ও সংক্ষিপ্ত রাখে, এ দেশে তত বেশী ভাল। কুন্তলাও চুপ রইল।

শুধু ও দেখল।

যেমন সে এখন দেখছে পরদার পিছনে দাঁড়িয়ে।

হ্যাঁ, পৌরুষ পরাস্ত হয়েছিল দু মাস পরই। হাতের একটা আংটি বিক্রি ক'রে রেশন নিয়ে যেদিন অসিত ঘরে ফিরেছিল।

কুন্তলা সেদিন আর চুপ ক'রে থাকতে পারে নি। দু মাস রোজ আট আনা দশ আনা ট্রাম-ভাড়া খরচ ক'রে ক'রে যে চাকরি যোগাড় করতে পারে নি, তৃতীয় মাসেও সেদিক থেকে তার কোনও আশা আছে, অন্তত কুন্তলার মনে হল না।

'আমি ব্যবসা করব।' অবশেষে অসিত বলল। কুন্তলা তাতেও রাজি হল।

'টাকা পাবে কোথায়?' জিজ্ঞেস করেছিল শুধু ও।

তার প্রভিডেন্ট ফণ্ডের টাকা। চাকরি খুইয়ে যে টাকাটা নিয়ে অসিত বেরিয়েছিল, তার ক'টা তখন পর্যন্ত আলাদা ক'রে রাখা হয়েছিল ব্যাঙ্কে। শেষ সম্বল। টাকার কথা বলা শেষ ক'রে অসিত বলল, 'ফাইন রাস্তা! চমৎকার একটা ডাইং ক্লিনিং খোলা যায় আমাদের বসবার ঘরটায়।'

যেন ডাইং ক্লিনিং খুলবে সিদ্ধান্ত ক'রেই অসিত টাকাটায় এতকাল হাত দেয় নি। কুন্তলা চুপ ক'রে রইল এবং ইতোমধ্যে কুন্তলার এক জোড়া দুল ও অসিতের একটা আংটি বিক্রি করা হয়েছিল সংসার খরচ বাবত, সে কথাও সত্য।

কুন্তলা গম্ভীর হয়ে উত্তর করেছিল শুধু, 'যদি বোঝ ডাইং ক্লিনিং চালাতে পারবে, তবে তাই কর। আমি আর বলব কি!' আইডিয়াটা তার মন্দ লাগছিল না যদিও।

সেই টাকায় ডাইং ক্লিনিংএর কেবল একটা সাইন বোর্ড করা হয়েছিল, আগেই বলা হয়েছে। বাকি সমস্ত খরচ বহন করতে হয়েছে কুন্তলাকে।

কাজেই, ডাইং ক্লিনিং খোলা সম্পর্কে কুন্তলার উৎসাহ যত, উৎকণ্ঠার মাত্রা তার চেয়ে অনেক বেশী।

ডাইং ক্লিনিংএর ভালমন্দর সঙ্গে তার গায়ের অনেকগুলো সোনা জড়ানো।

স্ক্রিন সরিয়ে, দোকানে যখন কোনও খদ্দের থাকে না, অসিত এসে ভিতরে ঢোকে। মানে কুন্তলার কাছে দাঁড়ায়। 'একটু চা কর।' বলে আস্তে আস্তে।

কুন্তলা প্রথম-প্রথম কিছু বলত না।

সেদিন বলল। অবশ্য অসিতের বেশভূষা একটু বেশী জমকালো হয়েছিল সেই সন্ধ্যায়।

'বেশ চোখে-মুখে কথা বলতে পার আজকাল।'

'কি রকম?' একটু হেসেছিল অসিত। আর, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখে নিচ্ছিল। কুন্তলা চা করছে।

'এ পাড়ায় মেয়ে বেশী।' কুন্তলা বলল একটু পর।

'কেন? শার্ট-পাঞ্জাবি তো কম আসছে না!' বলে অসিতও হাসল। পরিবর্তন হয়েছিল তার কথাবার্তার।

কুন্তলা টের পেয়েও চুপ ছিল।

যেমন পরিবর্তন হয়েছে অসিতের কাপড়চোপড়ের, চেহারার, চুলের।

যখন ব্যাঙ্কে চাকরি করত ও, তখন কানের উপর লম্বা-লম্বা চুল পড়ে থাকত। আধময়লা একটা খদ্দরের পাঞ্জাবি পরে রোজ অফিসে গেছে।

এখন দু বেলা স্নো-পাউডার, শেভিং ও জামা-কাপড় বদলানো চলছে।

করতেই হবে, উপায় কি!

ফার্ন রোডের লন্ড্রি। লন্ড্রির মত নিজেকেও চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে রাখতে হবে। না হলে এই অঞ্চলের মেয়েরা আসবে কেন তোমার দোকানে, কি ছেলেরা!

'ভয়ংকর বাবুপাড়া।' অসিত মাঝে মাঝে বলে।

আবহাওয়াটা একটু তরল করবার জন্তে অসিত চা খেতে খেতে পরে বলল, 'আশালতার ব্লাউজটা তোমার গায়ে মানিয়েছে বেশ।'

কুন্তলা বলে, 'মিহিরবাবুর গরদে তোমাকে দেখাচ্ছে ভাল।' এ ধরনের কথা দুজনের মধ্যে এখন প্রায়ই হয়।

কেননা, কোনও আশালতা ডাইং ক্লিনিংএ জামা ধোয়াতে দিয়ে যদি এক মাসের উপর সেটা ফেলে রাখে তো, তা কুন্তলার গায়ে উঠতে বাধা নেই। উঠবেই।

কেননা, এই ব্লাউজ ধোলাই করার পিছনে কুন্তলার গাঁটের পয়সা রয়েছে।

আর কোনও মিহিরবাবু যদি ধোয়া পাঞ্জাবি পয়সার অভাবে লন্ড্রি থেকে ছাড়িয়ে না নিতে পারে তো সেটা গায়ে দেয় অসিত। দিয়েছে।

এমনিও তাকে দিতে হত।

নিত্য ধোপদুরস্ত জামা-কাপড় গায়ে দিয়ে সেজে-গুজে দোকানে দাঁড়িয়ে থাকার মত যথেষ্ট জামা-কাপড় তার কোনও দিনই নেই।

কাল পরেছিল সে কোন্ এক টি কে রায়ের ট্রাউজার।

ফার্ন রোডেরই তৃপ্তিকুমারের ট্রাউজার কিনা, ওটা পরবার সময় অসিত অবশ্য ভেবেছিল। যেই হ'ক। আগামী কাল পরবে সে বিমলকুমারের পপলিনের হাফ শার্ট। বলল সে দরাজ গলায় কুন্তলাকে, 'খুব স্মার্ট দেখাবে আমাকে।' কথার শেষে অসিত হাসল। কুন্তলা বলল, 'আমি পরব কাল মৃদুলা বোসের টিস্যু-শাড়ি। ওটার উপর আমার ভয়ংকর লোভ।'

'প'রো, নিশ্চয়ই পরবে। লন্ড্রির জিম্মায় যতক্ষণ যে শাড়ি-ব্লাউজটি থাকবে, ততক্ষণ সেটি তোমার।' বলে কথায় সময় কর্তন ক'রে অসিত আবার দোকানে ফিরে গেল। কুন্তলা স্ক্রিন্ ধরে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

এই বৈঠকখানায়, দরজার সামনে, ইজিচেয়ার টেনে অসিত কোনও কোনও দিন রবীন্দ্রনাথ পড়ত। অবশ্য যখন অসিতের চাক্‌রি ছিল। বেকার অবস্থায় কে কবে আর কাব্যচর্চা করে! না, তা নয়—এককালে যে এই অসিতবরনই কাব্যচর্চা করেছিল, কুন্তলার এখন তা আবার বেশ মনে পড়ল।

এবার একসঙ্গে তিনটি এসে দাঁড়িয়েছে কাউণ্টারের সামনে।

'হ্যাঁ, জয়পুরী শাড়ি। দেখছেন না সুতোর উপর কি চমৎকার সিল্কের কাজ!'

'অদ্ভুত!' দু হাতে জয়পুরী জড়াতে জড়াতে অসিত উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। 'চোখ জুড়োয়।'

'দেখবেন, অ্যাসিড ঢেলে আবার যেন সর্বনাশ না করেন!'

'পাগল!' অসিত আবেগে মাথা নাড়ে। 'আপনাদের এক-একটা শাড়ির জন্যে কতটা যত্ন-পরিশ্রম—'

'মণিপুরী।'

'সুন্দর।' হাত বাড়িয়ে অসিত মণিপুরী টেনে নেয়।

'খাঁটি অস্‌ট্রেলিয়ান ভয়েল্। খুব সাবধান! রং যেন—'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়।' ময়লা কাপড়ের গাদায় ভয়েল্ ঠেলে দিয়ে অসিত সোজা

'নমস্কার।'

'নমস্কার।'

দরজা, সিঁড়ি—লনড্রির মালিক বাইরে বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দেয় মেয়েদের। •

বাঁ হাতে পরদার কোণাটা টেনে দিয়ে কুন্তলা রান্নার আয়োজনে সরে পড়ে।

যেতে যেতে সুন্দর একটা হাসির শব্দ সে শোনে বইকি! গাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে পুরুষ বলে, 'মাই বেস্ট্ এফর্ট, বুঝলেন না! এখন তো আর আমি লাভের দিকে তাকাচ্ছি না! আপনাদের স্যাটিস্‌ফ্যাক্‌শন্, সেটাই হল বড় কথা। আর—আর, যত বেশী—'

'সব, সবাই আসবে আপনার কাছে শাড়ি-শায়া নিয়ে—ফার্ন রোডের সমস্ত মেয়ে। আপনি ডাইং ক্লিনিং খুলেছেন যখন।' তিনটি গলার কলকাকলি।

'হ্যাঁ, আপনাদের জন্যেই তো কুন্তলা ক্লিনিং।'

কুন্তলা দাঁড়ায় না। রান্নাঘরের দরজার দিকে পা বাড়ায়।

সারা দিন যেমন-তেমন, রাত নটার সময় লনড্রির মালিকের তর্জন-গর্জন বড় বেশী শোনা যায়। কুন্তলা শোনে স্ক্রিনের কাছে দাঁড়িয়ে, দেখে।

ধোয়া কাপড়ের গাঁটরি গাধার পিঠে চাপিয়ে ছেলেটা লনড্রির দরজার কাছে ভাল ক'রে পৌঁছতে পারে না, ছুটে গিয়ে বাজপাখির মত ছোঁ মেরে অসিত বোঁচকাটা টেনে নিয়ে আসে ঘরে।

'এত দেরি কেন? এত দেরি করলে চলে কখনও?' অসিত ধোবার ছেলেকে ধমকায়। 'এতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মীনাক্ষী দেবী ফিরে গেলেন। সত্যি তো, কত রাত আর অপেক্ষা করবেন দোকানে ভদ্রমহিলা একটা বডিজের জন্যে! টাইম, টাইম—টাইম্‌লি যদি কাপড় ধুয়ে না আনতে পার তো আমার কাপড় নিয়ে কাজ নেই।'

'অনেক দূর থেকে আসতে হয়।' মাটির দিকে মুখ ক'রে মানকে আম্‌তা-আম্‌তা করে।

'তবে কাজ ছেড়ে দে না কেন, আমি অন্য ধোবা ঠিক করি।' ব্যস্ত আঙুলে অসিত গাঁটরি খোলে। 'এ কি! এ কাপড়ের পাড় এমন হল কেন? উঁহুঁ, রেবা মিত্তিরের শাড়ি, জজের মেয়ে, আমায় আস্ত গিলে ফেলবে। রংটি পাকা ক'রে তবে দোকানে এসো।' অসিত কাপড়টা ফের দলা পাকিয়ে ছুঁড়ে দেয় মানকের পায়ের কাছে। মানকে হা ক'রে বাবুর মুখের দিকে তাকায়।

'আমায় দেখছিস কি ?' অসিত আবার গর্জে ওঠে। আর একটা কি হাঁতে উঠেছে তার। 'কনকলতার সুজনির এমন দশা হল কেন ? এত ব্লিচিং চালতে তোমায় বলেছিল কে ? কি সুন্দর সবুজ ফুল ছিল—সব ধুয়ে-মুছে একাকার। এই দেখ!' অসিতের সমস্ত মুখ কুঁচকে ওঠে। 'শীলা দেবীর অর্গ্যাণ্ডির ব্লাউজ—কলপ লাগানোর ছিরি দেখ। না, কারবার আমার ফেল্ পড়াবে! হেনা সেনের হাফ-হাতা ব্লাউজ কই ?'

'ভুল হয়েছে, কাল নিয়ে আসব।'

'শকুন্তলার সাটিনের জামায় এত নীল দিতে গেলি কেন ?'

'কাল ঠিক ক'রে আনব, দিন্।' মান্‌কে হাত বাড়ায়। অসিত ফোঁস্ কাটে। 'শুয়ার! কাল—সে তো রাত সাড়ে নটায়। সকালবেলা মিসেস সেন যখন জামার জন্যে আমার চুল ছিঁড়বে, তখন আমি কি করব!'

বোকার মত হাঁ ক'রে মান্‌কে বাবুর মুখের দিকে তাকায়। বাবু পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে কপালের ঘাম মোছেন। সিগারেট ধরান।

দোকানে মেয়েদের কাপড়ের তদারক করতে অসিত যত বেশী ঘামল, পরদার এপারে দাঁড়িয়ে কুন্তলা তার চেয়ে ঢের বেশী ঘামল।

পরদিন দুপুরবেলা কি ভেবে কুন্তলা গিয়ে ঢুকল দোকানে। লক্ষ করল ও, সামনের দরজা দুটো ভিতর থেকে বন্ধ।

এই দুপুরে কোনও ছেলে আসে না কাপড় ধোয়াতে, কি ধোয়া কাপড় ফিরিয়ে নিতে কোনও মেয়ে।

তাই দরজা বন্ধ থাকে। আর লন্‌ড্রির বাবু ভাত খেয়ে পান চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে যান বন্ধুর বাড়ি তাস পিটতে।

চাকরি খোঁজার সময়ও অসিতকে ঘোরাফেরা ছোটাছুটি ক'রেই দুপুর কাটাতে হয়েছে; আর চাকরি যখন, তখন তো করতই!

বরং দোকান খোলার পরই সুবিধা হয়েছে বেশী। সময়ের।

কুন্তলা ভাবল, অঢেল অবসর এখন অলস কোনও বন্ধুর বাড়িতে হানা দিয়ে নিটোল তিন হাত ব্রিজ খেলার। এই কারবারটার সুবিধা মস্ত।

কুন্তলা বুড়ো শশীর কাছে এসে দাঁড়ায়।

'এটা কার পাঞ্জাবি ?'

'পলাশবাবুর।'

'ইস্ত্রি ঠিক হচ্ছে না।'

গরম ইস্ত্রি হাত থেকে নামিয়ে রেখে শশী মাইজির মুখের দিকে তাকায়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম কপালে।

'আরও কড়া হবে, কলার দুটো হবে কাগজের মতো ফুর্‌ফুরে।' টাল থেকে একটা শার্ট টেনে কুন্তলা বলল, 'কার জামা?'

'রণধীরবাবুর।'

'ইস্ত্রি আরও কড়া কর।' কুন্তলা ভাঁজ-করা শার্ট বুড়ো শশীর কাছে ফেলে দেয়।

শশী ভারি ইস্ত্রিটা তুলে স্টোভের উপর বসায়।

এই প্রথম লক্ষ করল কুন্তলা, আলমারি দুটোর একটায় কাঁচ আছে, আর একটায় কাঁচ নেই। কাঁচ-লাগানো আলমারিতে শাড়ি, ব্লাউজ, বডিজ থরে থরে সাজানো। রঙিন সব রুমাল। লাল, বেগনী, চকোলেট রঙের শায়া। কাগজ দিয়ে যত্ন ক'রে মোড়া। ছোট ছোট টিকিটের উপর মোটা নীল পেন্‌সিলে নাম লেখা: 'অমিতা', 'শকুন্তলা', 'পূর্ণিমা', 'রেবা', 'কাবেরী'— অসিতের রাবীন্দ্রিক স্টাইলে লেখা হস্তাক্ষর।

আর একটা আলমারির থাকে থাকে নামহীন সাদা, কালো, ব্রাউন রঙের সব কোট, শার্ট, টাই, পেন্টুলন, ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবি।

কাগজও নেই, টিকিটও নেই।

ধুলো পড়ার মতন অবস্থা।

সংখ্যায় তারা শীর্ণ, চেহারাও দীন।

রাত্রে কুন্তলা বলল, 'মান্‌কে ছোঁড়াকে ইস্ত্রি করতে দাও। শশী যাক কাপড় ধুতে।'

হঠাৎ এই প্রস্তাবে অসিত একটু চমকে উঠল। কেননা, মান্‌কে কাপড় ধোয়, কাপড়ে রং লাগায়। ওর মাইনে বেশী।

শশী শার্ট-পাঞ্জাবির পিঠে গরম লোহা বুলোয়। ওর মাইনে কম।

'তাতে কি সুবিধা হবে?' আম্‌তা-আম্‌তা করে অসিত।

'নিশ্চয় হবে।' কুন্তলা শক্ত গলায় উত্তর করে। 'ইস্ত্রি ভাল হচ্ছে না বলেই শার্ট-পাঞ্জাবি কম আসছে।'

'এটা রঙের যুগ।' যেন রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করার মত সুর ক'রে অসিত অল্প হেসে বলল, 'মেয়েরাই লন্‌ড্রিতে বেশী ভিড় করবে।'

'এইজন্যেই বুঝি রঙের দিকে তুমিও বেশী ঝুঁকেছ?' কুন্তলা না বলে পারল না।

'বেশ, তুমি ইস্ত্রির দিকটায় উন্নতি কর।' অসিত যেন নিরুপায় হয়ে, কারবারে কুন্তলার বেশী টাকা দেওয়ার কথা ভেবে, শেষটায় বলল, 'আমার তো মনে হয়, তাতে অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না।'

'মানে, রঙের দলই বেশী আসবে?' রাগত চোখে কুন্তলা অসিতের দিকে তাকায়। 'এইজন্যেই বুঝি ফার্ন রোডে পাড়ার মধ্যে আর কোনও কারবার খুঁজে না পেয়ে শেষটায় ডাইং ক্লিনিং খুললে?' অসিত চুপ।

জিদ্ ক'রে কুন্তলা বুড়ো শশীকে পাঠাল ধোয়ার কাজে, আর ইস্ত্রির কাজে টেনে আনল তাগড়া মান্‌কে ছোঁড়াকে।

'তুই এখন খুব ফিট্‌ফাট থাকবি, বুঝলি?' দুপুরবেলা কুন্তলা মান্‌কেকে বোঝাল, 'আর ভাল ইস্ত্রি করলে সামনের মাসে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

মান্‌কে সেলুনে চুল ছেঁটে এল কুন্তলার পয়সায়। একটা সাদা হাফ প্যাণ্ট পরল কুন্তলার নির্দেশ অনুযায়ী।

পান খেয়ে ঠোঁট লাল করল। গেঁয়ো ভাবটা একদম নেই।

'এ পাড়ায় বাবু বেশী।' কুন্তলা বোঝায়, 'যত ভাল ইস্ত্রি করবি, নগদ বকশিশ মিলবে তত।'

মহা-উৎসাহে মান্‌কে ইস্ত্রি ঠেলে।

আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে জোয়ান মুখ।

ঘামের ফোঁটা দেখা দেয় কপালে-বুকে।

কিন্তু, বিশেষ কিছু ফল হল কি!

চৈত্রের শেষ। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে।

ফার্ন রোডের কৃষ্ণচূড়ার মাথা লাল হয়ে গেল।

আর নানা রঙে ভরে উঠল [illegible] ক্লিনিং-এর কাঁচের আলমারি।

কুন্তলা গুণে দেখল, শার্ট-পাঞ্জাবির সংখ্যা আট, শাড়ি-শায়ার সংখ্যা আটচল্লিশ।

হাসে অসিত।

গাল ভরে উঠেছে। চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে তার ক'দিনে। মুখে পুরু বর্মা চুরুট। গায়ে কোন্ এক সলিলকুমারের সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে এক পবিত্র রায়ের সন্ত পাট-ভাঙা শান্তিপুরী।

কারবার ভাল চলেছে।

'শার্ট-পাঞ্জাবির অভাব পূরণ করছে শাড়ি-ব্লাউজ।' এক সন্ধ্যায় অসিত বলল, 'এক দিক দিয়ে এলেই হল, কেমন!'

গরম ইস্ত্রি হাত থেকে নামিয়ে রেখে শশী মাইজির মুখের দিকে তাকায়। ফোঁটা ফোঁটা ঘাম কপালে।

'আরও কড়া হবে, কলার দুটো হবে কাগজের মতো ফুরফুরে।' টাল থেকে একটা শার্ট টেনে কুন্তলা বলল, 'কার জামা?'

'রণধীরবাবুর।'

'ইস্ত্রি আরও কড়া কর।' কুন্তলা ভাঁজ-করা শার্ট বুড়ো শশীর কাছে ফেলে দেয়।

শশী ভারি ইস্ত্রিটা তুলে স্টোভের উপর বসায়।

এই প্রথম লক্ষ করল কুন্তলা, আলমারি দুটোর একটায় কাঁচ আছে, আর একটায় কাঁচ নেই। কাঁচ-লাগানো আলমারিতে শাড়ি, ব্লাউজ, বডিজ থরে থরে সাজানো। রঙিন সব রুমাল। লাল, বেগনী, চকোলেট রঙের শায়া। কাগজ দিয়ে যত্ন ক'রে মোড়া। ছোট ছোট টিকিটের উপর মোটা নীল পেন্‌সিলে নাম লেখা: 'অমিতা', 'শকুন্তলা', 'পূর্ণিমা', 'রেবা', 'কাবেরী'— অসিতের রাবীন্দ্রিক স্টাইলে লেখা হস্তাক্ষর।

আর একটা আলমারির থাকে থাকে নামহীন সাদা, কালো, ব্রাউন রঙের সব কোট, শার্ট, টাই, পেণ্টুলন, ধুতি, পাজামা, পাঞ্জাবি।

কাগজও নেই, টিকিটও নেই।

ধুলো পড়ার মতন অবস্থা।

সংখ্যায় তারা শীর্ণ, চেহারাও দীন।

রাত্রে কুন্তলা বলল, 'মানুকে ছোঁড়াকে ইস্ত্রি করতে দাও। শশী যাক কাপড় ধুতে।'

হঠাৎ এই প্রস্তাবে অসিত একটু চমকে উঠল। কেননা, মানুকে কাপড় ধোয়, কাপড়ে রং লাগায়। ওর মাইনে বেশী।

শশী শার্ট-পাঞ্জাবির পিঠে গরম লোহা বুলোয়। ওর মাইনে কম।

'তাতে কি সুবিধা হবে?' আমতা-আমতা করে অসিত।

'নিশ্চয় হবে।' কুন্তলা শক্ত গলায় উত্তর করে। 'ইস্ত্রি ভাল হচ্ছে না বলেই শার্ট-পাঞ্জাবি কম আসছে।'

'এটা রঙের যুগ।' যেন রবীন্দ্রনাথ আবৃত্তি করার মত সুর ক'রে অসিত অল্প হেসে বলল, 'মেয়েরাই লন্ড্রিতে বেশী ভিড় করবে।'

'এইজন্যেই বুঝি রঙের দিকে তুমিও বেশী ঝুঁকেছ?' কুন্তলা না বলে পারল না।

'বেশ, তুমি ইস্ত্রির দিকটার উন্নতি কর।' অসিত যেন নিরুপায় হয়ে, কারবারে কুন্তলার বেশী টাকা দেওয়ার কথা ভেবে, শেষটায় বলল, 'আমার তো মনে হয়, তাতে অবস্থার বিশেষ কোনও পরিবর্তন হবে না।'

'মানে, রঙের দলই বেশী আসবে?' রাগত চোখে কুন্তলা অসিতের দিকে তাকায়। 'এইজন্তেই বুঝি ফার্ন রোডে পাড়ার মধ্যে আর কোনও কারবার খুঁজে না পেয়ে শেষটায় ডাইং ক্লিনিং খুললে?' অসিত চুপ।

জিদ্ ক'রে কুন্তলা বুড়ো শশীকে পাঠাল ধোয়ার কাজে, আর ইস্ত্রির কাজে টেনে আনল তাগড়া মান্‌কে ছোঁড়াকে।

'তুই এখন খুব ফিট্‌ফাট থাকবি, বুঝলি?' দুপুরবেলা কুন্তলা মান্‌কেকে বোঝাল, 'আর ভাল ইস্ত্রি করলে সামনের মাসে দশ টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেব।'

মান্‌কে সেলুনে চুল ছেঁটে এল কুন্তলার পয়সায়। একটা সাদা হাফ প্যান্ট পরল কুন্তলার নির্দেশ অনুযায়ী।

পান খেয়ে ঠোঁট লাল করল। গেঁয়ো ভাবটা একদম নেই।

'এ পাড়ায় বাবু বেশী।' কুন্তলা বোঝায়, 'যত ভাল ইস্ত্রি করবি, নগদ বকশিশ মিলবে তত।'

মহা-উৎসাহে মান্‌কে ইস্ত্রি ঠেলে।

আগুনের মত লাল হয়ে ওঠে জোয়ান মুখ।

ঘামের ফোঁটা দেখা দেয় কপালে-বুকে।

কিন্তু, বিশেষ কিছু ফল হল কি!

চৈত্রের শেষ। ফুরফুরে হাওয়া দিয়েছে।

ফার্ন রোডের কৃষ্ণচূড়ার মাথা লাল হয়ে গেল।

আর নানা রঙে ভরে উঠল [illegible] ক্লিনিংএর কাঁচের আলমারি।

কুন্তলা গুণে দেখল, শার্ট-পাঞ্জাবির সংখ্যা আট, শাড়ি-শায়ার সংখ্যা আটচল্লিশ।

হাসে অসিত।

গাল ভরে উঠেছে। চেহারা যেন আরও ভাল হয়েছে তার ক'দিনে। মুখে পুরু বর্মা চুরুট। গায়ে কোন্ এক সলিলকুমারের সিল্কের পাঞ্জাবি, পরনে এক পবিত্র রায়ের সন্ত পাট-ভাঙা শান্তিপুরী।

কারবার ভাল চলেছে।

'শার্ট-পাঞ্জাবির অভাব পূরণ করছে শাড়ি-ব্লাউজ।' এক সন্ধ্যায় অসিত বলল, 'এক দিক দিয়ে এলেই হল, কেমন!'

গম্ভীর হয়ে কুন্তলা বলল, 'হুঁ।'

'আমি ভেবেছি, আমি ভাবছি,' চা খেতে খেতে অসিত আবার বলল, 'শশীর আরও ক'টা টাকা মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া ভাল।'

কুন্তলা চুপ।

'শশী এখন বেশ কাজ করছে।' অসিত একটু থেমে বলল, 'দোকানের আয় বেড়েছে যখন, ওকে ক'টা টাকা বেশী দিতে আপত্তি কি?'

'না, আপত্তি কি! শাড়ি-শায়া পেয়ে বুড়োর মেজাজ খুলে গেছে, তাই না?' অদ্ভুত হেসে কুন্তলা হঠাৎ উঠে যায়।

চায়ের বাটি আস্তে আস্তে নামিয়ে রেখে অসিত চলে আসে দোকানে।

ওরা সব দাঁড়িয়ে আছে, ভিড় ক'রে আছে কাউণ্টারে।

কুন্তলা ওদের দেখবে না বলেই পরদার কাছে না দাঁড়িয়ে সোজা রান্নাঘরে ঢোকে।

কি খেয়াল হল সেদিন কুন্তলার হঠাৎ। বেশ রাত হয়েছে, দোকানের কলকাকলি স্তব্ধ হয়েছে অনেকক্ষণ, অসিতের হাসি নিভে গেছে—টের পেল।

পরদার কাছে এসে কুন্তলার আর পা সরল না।

পর্যন্ত শশীও চলে গেছে কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে।

না, গুচ্ছের মেয়ে নয়—একটি, একজন।

কটকী শাড়ির একটুখানি ঝলক চোখে পড়ল কুন্তলার। প্রথমে দরজায়, তারপর বারান্দায়। আশ্চর্য, তারপর বাইরে ওর পিছন-পিছন রাস্তায় নেমে গেল অসিত।

'ভাল।' কুন্তলা দাঁতে দাঁত চাপল

প্রায় দশ মিনিট পর হাসতে হাসতে ফিরে আসে অসিত।

'হাসছ যে?' কুন্তলা ভুরু কুঁচকোয়।

'এমনি।'

'এমনি অর্থ কি?' ঢোঁক গিলল কুন্তলা। 'মেয়েটা কে?'

'এ পাড়ারই হবে।' দোকানের দরজা বন্ধ ক'রে অসিত কুন্তলার দিকে ঘুরে দাঁড়ায়। 'খদ্দের।'

'এত রাত্রে?' অবাক না হবার ভান ক'রেই কুন্তলা একটু হাসল। 'শাড়ি নিয়ে এসেছিল, না শায়া?'

'শার্ট।' গম্ভীর হয়ে বলল অসিত, 'ইস্ত্রি করাতে এসেছিল।'

'এ পাড়ার মেয়ে শার্ট ইস্ত্রি করাবে?' অবিশ্বাস থম্‌থম্‌ করছিল কুন্তলার চোখে। 'কেন, ওর শাড়ি ধোয়ানো, ব্লাউজের রং ফোটানোর কাজ শেষ হয়েছে?'

চুপ ক'রে রইল অসিত।

'কার শার্ট?' ফের প্রশ্ন কুন্তলার।

'স্বামীর।' অসিত আস্তে বলল।

'মিথ্যেবাদী!' চোখ জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে কুন্তলার। 'ওর সঙ্গে সঙ্গে বাইরে গেছলে কেন?'

'বুঝিয়ে বললাম, ইস্ত্রির সময় তো এখন না—দুপুরে আসবেন।'

'দুপুরে আসবেন, দুপুরেও আমি দোকানে থাকব এখন থেকে, তাই না?' কুন্তলা কড়িকাঠের দিকে তাকাল।

'তুমি বিশ্বাস করছ না—' বলতে গিয়ে অসিত হঠাৎ থামল।

'না, অবিশ্বাসের আছে কি!' কেমন অদ্ভুত স্বর ফুটল কুন্তলার গলায়। 'দোকানের আয় বেড়েছে তোমার, মেজাজ খুলেছে—ওকে নিয়ে যদি লেকের ধারে ঘুরে আসতে, তাতেও বলার কিছু ছিল না আমার। ছিল কি?'

'আশ্চর্য!' অসিত আস্তে বলল।

'আশ্চর্যের কিছুই নেই।' কঠিন হয়ে গেল কুন্তলার চাহনি। 'আপত্তি ছিল আমার বেলায়, আমি কেন চাকরি করব বাইরে গিয়ে, আমার—'

'তুমি ভুল বুঝছ, কুন্তল।' অসিত বলতে গেল, বাধা দিল কুন্তলা। 'আর বোঝাবুঝির দরকার নেই—রং নিয়ে আছ, রং নিয়ে থাক। খামকা আর ইস্ত্রির কথা টেনে এনে আমায় ভোলাচ্ছ কেন? আমি কি বুঝি না, আমি কি চোখের উপর সব দেখছি না?' ঠোঁট দুটো [illegible]ছিল কুন্তলার।

'দেখো, কাল ও ঠিক আসবে [illegible] নিয়ে।' অসিত বলল।

'থাক।' কুন্তলা ফিরে গেল রান্নাঘরে।

পরদিন র'ববার। দুপুরবেলা। বাবু বেরিয়ে গেছেন বন্ধুর বাড়ি তাস পিটতে। মানুকে দোকানে। কুন্তলা ভিতরে। এমন সময়।

দোকানের দরজা নড়ে উঠল। সত্যি কি ওই মেয়ে এল ইস্ত্রি করাতে, ভাবল কুন্তলা।

'কে?' মানুকে তাড়াতাড়ি দরজা খুলে দেয়।

পুরুষ। আধময়লা একটা শার্ট গায়ে। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

যেন অনেক দিন পর ইস্ত্রির খদ্দের দেখে মান্‌কে খুশী হল। 'আসুন, নমস্কার।' চেয়ার এগিয়ে দেয় সে আগন্তুকের দিকে।

'আমার একটু কাজ ক'রে দিবি?' যুবক আস্তে আস্তে বলল। কাগজে-মোড়া কি একটা জিনিস বগলে। দাঁড়াল কাউণ্টার ঘেঁসে।

'শার্ট ইস্ত্রি হবে? পাঞ্জাবি?' মান্‌কে মোড়কের উপর চোখ রাখল।

মাথা নেড়ে যুবক অল্প হাসল। 'আমার নয়, ওর। ওর শাড়ি-ব্লাউজ ধোয়াতে হবে, রং ফোটাতে হবে।'

কেমন নিস্তেজ হয়ে গেল মান্‌কের চেহারা।

'আপনার শার্ট-পাঞ্জাবি?' খদ্দেরের ময়লা বেশভূষার দিকে চোখ রেখে যেন বিড়বিড় করল মান্‌কে। 'ইস্ত্রি-টিস্ত্রি কিছু—'

'আমারটার তো দরকার আগে নয়, দরকার বেশী ওরটার জন্যে!' নিস্তেজ হাসল পুরুষ।

বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ তাকিয়ে মান্‌কে।

'কাল রাত্রে এই নিয়ে রীতিমত ঝগড়া হয়ে গেল, বুঝলি।'

'হুঁ।' কি বুঝল ধোবার ছেলে, কি যেন বুঝল না।

'বলছিলাম, পয়সা কম, তোমার শাড়ি-ব্লাউজ আরও দু দিন গায়ে দেওয়া চলে, বরং আমার কাপড়চোপড়—'

'আপনার স্ত্রী?' যেন এতক্ষণ পর বুদ্ধিমান মান্‌কের পেটে কথা ঢুকল, অল্প হেসে চোখ বড় ক'রে বলল, 'কি বললেন তিনি তার উত্তরে?'

'কি আর বলবেন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলে যুবক কাউণ্টারের উপর কনুইএর ভর রাখল, শরীরের ভার। 'উল্‌টো রাগ ক'রে রাত্রে আমার একটা শার্ট ইস্ত্রি করাতে নিয়ে এসেছিল। তুই ছিলি না দোকানে, দেখিস নি?'

মান্‌কে মাথা নাড়ল।

'বলছিল, কে দেখে তোমার ধোয়া পাঞ্জাবি, জামার ইস্ত্রি? যদি দেখতই তো বড় সাহেব এই দু মাসে আমার মাইনে দুবার না বাড়িয়ে তোমার মাইনেই বাড়াত—' বলে যুবক অল্প-অল্প হাসল।

'আপনারা বুঝি—'

'হুঁ, এক অফিসে চাকরি।' মান্‌কের হাতের কাছে পুঁটলিটা ঠেলে দিয়ে পুরুষ সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'ইস্ত্রির দাম নেই এদিনে—বুঝলি না, এখন রঙের কদর!'

পরদার এপারে দাঁড়িয়ে কুন্তলা সব শুনল, দেখল।

সোনার সিঁড়ি

ঋষিতুল্য লোক তারাপদবাবু। তারাপদ রায়। কিন্তু তা হলে হবে কি। সংসারে যাঁরা সৎ ও মহানুভব, তাঁরা দুঃখ পান বেশী। দুঃখ তাঁদের কাঁধে পাকাপাকিভাবে আসন পেতে বসে—কিছুতেই নড়তে চায় না।

দীর্ঘকালের অদর্শনের পর সেদিন তারাপদবাবুকে দেখে কথাটা আবার মনে হল। বিষণ্ণ নিঃসঙ্গ মূর্তি, ক্লান্ত অসহায় দৃষ্টি। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে আছেন। 'কেমন আছেন?' প্রশ্নটা অন্তভাবে করলাম। 'আপনার শরীর এখন কেমন, সেই যে প্রস্রাবে একটু সুগার পাওয়া গিয়েছিল। গরমটায় ছিলেন কেমন?'

'ও কিছু না, ও কমে গেছে।' চিরকাল যা তাঁর স্বভাব, নিজের দুঃখ অপরে বুঝতে না পারে, তার প্রাণপাত চেষ্টা ক'রে বিশেষ ব্যস্ত হয়ে তারাপদ-বাবু বললেন, 'বসুন, বসুন। কবে ফিরলেন? তারপর, আপনার ব্যবসা-বাণিজ্য চলছে কেমন?'

'মোটামুটি ভাল। পরশু ফিরেছি ক'লকাতায়।' ঈষৎ হেসে কথাটা বললেও বেশ তীক্ষ্ণভাবেই তাঁর দিকে তাকিয়ে লক্ষ করলাম, ক'মাসে তিনি আরও বেশী বুড়িয়ে গেছেন, কপালের রেখা ক'টা আরও গভীর ও দীর্ঘ হয়েছে। যেন পরমুহূর্তে আমি কি প্রশ্ন করব টের পেয়ে তারাপদবাবু তাড়াতাড়ি চাকরকে ডাকলেন, 'কুই রে, বাবুকে চা দিলি নে!'

বললাম, 'দেবে, আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন! একবার তো খেয়ে বেরিয়েছি! তারপর—' চুপ ক'রে গেলাম। লক্ষ করলাম, তারাপদবাবুও হঠাৎ অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে ঘরের মেঝের দিকে চেয়ে আছেন। শূন্য, আর্ত চাহনি। একটা ঢোঁক গিললাম। আর একটুক্ষণ কাটতেই আমার খেয়াল হল, যেন বাড়িটা বড় বেশী চুপচাপ হয়ে আছে। যেন কে নেই, কারা নেই। তারাপদবাবুর মত আমিও গম্ভীর হয়ে তাঁর পিছনে টাঙানো দেওয়ালপঞ্জীটা দেখতে লাগলাম। চাকর টেবিলে চা রেখে গেল। দেওয়ালের কোন্‌দিকে একটা টিকটিকি শব্দ ক'রে উঠল। 'তারপর, বাইরে জিনিসপত্র ক'লকাতার চেয়ে সস্তা দেখে এলেন নিশ্চয়!' তারাপদবাবু চোখ তুললেন।

'হ্যাঁ, কিছুটা—তাও সব না, দুধ মাংসটা একটু—' অপ্রাসঙ্গিক না হলেও নিতান্তই সময় কাটানোর জন্তে অথবা চট ক'রে মূল প্রসঙ্গ না টেনে আনি সতর্কতাস্বরূপ বেশ কায়দা ক'রে তারাপদবাবু অন্ত দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করছেন, বুঝতে কষ্ট হল না। কিন্তু ঐ 'একটু' পর্যন্ত বলার পর আমি থেমে যাওয়াতে তিনি যেন ধরা পড়ে গিয়ে, কেমন থতমত খেয়ে আবার মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন।

অবশ্ত তার কারণ ছিল। তারাপদ সারা জীবন যে কি অপরিমেয় ঘা খেয়েছেন এবং এখনও খাচ্ছেন সংসারে, আমার চেয়ে সে কথা আর কেউ বেশী জানে না। একসঙ্গে এক জায়গায় অনেক দিন দুজনে কাজ করেছি। ব্যবসার লাইনে চলে গেলেও তাঁর সঙ্গে আমার যোগসূত্র বরাবর বজায় আছে। সময় এবং সুযোগ পেলেই আমি দেখা করতে ছুটে আসি। তারাপদ নিঃসংকোচে তাঁর দুঃখের কথা আমাকে খুলে বলেন। এবার অনেক দিনের অসাক্ষাতে বেশ একটু সংকোচ বোধ করছেন টের পেয়ে আমি আস্তে আস্তে প্রশ্ন করলাম, 'রমাপদর আর কোন খবর পেয়েছেন কি? সে বাড়ি এসেছিল?'

একটু সময় চুপ থেকে তারাপদবাবু আমার মুখের দিকে তাকিয়ে এমন করুণভাবে হাসলেন যে, দেখে বড় কষ্ট হল।

'আপনি তো জানেন, আমার কষ্ট বাড়ানো ছাড়া কমানোর পাত্র সে নয়।' কথা শেষ ক'রে বাঁ হাতের তেলো দিয়ে তিনি চোখের কোণা মুছলেন।

একটুও ইতস্তত না ক'রে বললাম, 'আপনি খামকা দুঃখ করছেন। যে ফেরবার নয়, যার সংশোধনের কোনও আশা নেই, মিছিমিছি তার কথা ভেবে হায়-আফসোস ক'রে লাভ কি?' একটু থেমে পরে বললাম, 'কি, আবার টাকা চাইতে এসেছিল বুঝি?'

'না।' বলে তারাপদ আবার অতিমাত্রায় গম্ভীর হয়ে গেলেন।

'বৌমা ভাল আছেন তো? খুকু কেমন আছে?' এদিক-ওদিক তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম, 'কই নাতনিকে দেখছি না যে! বাইরে বেড়াতে গেল কি?'

'না।' হাতের তেলো দিয়ে তারাপদ আবার চোখ মুছলেন। 'খুকুকে ওর মামাবাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি।'

'বৌমা বাপের বাড়ি গেছেন বুঝি?' একটু ইতস্তত ক'রে বললাম, 'হঠাৎ?'

কিছু বললেন না তিনি। আমার চোখে চোখ রেখে তারাপদ শুধু বুক-ভাঙা হাসি হাসলেন। আমি চোখ সরিয়ে নিই। আশঙ্কা না শুধু, কেন জানি স্থির বিশ্বাস জন্মাল, এর পিছনে অর্থাৎ একটিমাত্র সন্তান সহ রমাপদর স্ত্রীর বাপের বাড়ি চলে যাওয়ার কারণও তারাপদর সুপুত্রটি। হ্যাঁ, রমাপদ—তারাপদবাবুরও চোখের মণি, একমাত্র সন্তান। অপদার্থ নিশ্চয় সম্প্রতি বাড়িতে এসে এমন কোন কাজ করেছে, যার জন্যে বৌ বাচ্চাটাকে নিয়ে এখান থেকে সরতে বাধ্য হয়েছে; কি দিনের পর দিন স্বামীর দুষ্কৃতি-দুরন্তপনার কথা শুনে শুনে লজ্জায়, দুঃখে এই সংসারের সকল বন্ধন, সমস্ত মায়া, আশা ত্যাগ ক'রে দুঃখিনী দূরে সরে গেল। এই হয়— এই স্বাভাবিক।

না, খুব যে একটা খারাপ ছেলে হবে রমাপদ, ছেলেবেলায় তা বোঝা যায় নি। তারাপদ বড় যত্ন করতেন, সর্বদা কাছে কাছে রাখতেন ছেলেকে। বিশেষ, খুব অল্প বয়সে ও মাকে হারায়। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করার ফলে সংসারে অশান্তি বাড়বে, রমাপদর অনাদর হবে বুঝতে পেরে তারাপদ সেই পথেই যান নি। তখন আর তাঁর বয়স কত, বত্রিশ-তেত্রিশ মোটে ছিল। কিন্তু তারাপদ তা গ্রাহ্য করেন নি। বরং ছেলের যত্ন ক'রে, সারাক্ষণ তার খাওয়া-পরা-স্বাস্থ্য-লেখাপড়ার কথা চিন্তা ক'রে তিনি সুখী ছিলেন। বছর যেতে লাগল, রমাপদ একটু একটু ক'রে বড় হতে লাগল। বেশ ভালভাবেই ও ম্যাট্রিক পাশ করল। দেখতেও বেশ সুশ্রী হয়ে উঠল। কতদিন তারাপদবাবু ছেলেকে নিয়ে অফিসে গেছেন। আমরা— তারাপদর বন্ধুরা— প্রায় কাড়াকাড়ি ক'রে রমাপদকে কাছে টেনে নিয়ে কোলে বসিয়ে আদর করেছি, কেক-সন্দেশ খাইয়েছি। চা খেত না। তারাপদ বলতেন, চায়ে লিভার খারাপ করে— আমি রোজ ওকে এক বাটি ক'রে টমেটোর রস খাওয়াই। বলতাম আমরা, টমেটো ফুরিয়ে গেলে কি খায় ছেলে? একটু ঠাট্টার সুর ছিল আমাদের কথায় টের পেয়েও তারাপদ তা গ্রাহ্য করতেন না; বলতেন, সরবতী লেবুর রস দিই, বেদানা দিই। শুনে আমরা চুপ ক'রে গেছি। হ্যাঁ, যেমন লেখাপড়া, তেমনি পুত্রের স্বাস্থ্য সম্পর্কে বাপের বড় বেশী সতর্ক দৃষ্টি ছিল। আর, তার ফলে রমাপদর গায়ের রংটিও হয়ে উঠেছিল উজ্জ্বল মসৃণ, সুন্দর গায়ের চামড়া। আমরা মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতাম। ষোল-সতের বছর বয়স তখন ওর। প্রথম যৌবনের লাবণ্য সর্বাঙ্গে পরিপূর্ণ হয়ে ফুটে উঠেছিল। ভ্রমরকৃষ্ণ গোঁফের রেখা, প্রতিভামণ্ডিত স্বচ্ছ সুন্দর চোখ, মখমলের মত

কুন্তকে ঝকঝকে কালো চুলে যে কি অদ্ভুত দেখাত তারাপদর ছেলেকে! সেই ছেলে কলেজে ভরতি হল। তারাপদ গাড়ি ঠিক ক'রে দিলেন ছেলেকে কলেজে নিয়ে যেতে, ছুটির পর বাড়ি পৌঁছে দিতে। রাস্তাঘাটে বাজে বখাটে ছেলেদের সঙ্গে মিশে রমাপদ না খারাপ হয়ে যায়, এই চিন্তা বাপের সর্বক্ষণ ছিল। হায়, সেই ছেলে কলেজে ভরতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কি হয়ে গেল! লেখাপড়ার দিকে আর মন নেই। সর্বদা কেমন অন্যমনস্ক হয়ে থাকত। কিছু বললে রমাপদ নাকি উত্তর দিত, কি হবে এইসব ধরাবাঁধা পাঠ্যপুস্তক মুখস্থ ক'রে! এসব হল কেরানী তৈরি করার ওষুধ—এগুলো গলাধঃকরণ ক'রে অফিসে চাকরি পাওয়া যেতে পারে, মানুষ হওয়া যায় না। শুনে তারাপদ স্তম্ভিত হয়ে যেতেন। অফিসে গোপনে আমাকে ডেকে সব বলতেন। একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে রমাপদকে কাছে ডেকে আদর ক'রে আমি অনেক বোঝালাম। বললাম, 'বেশ তো, অন্তত আই এ-টা পাস ক'রে ফেল। এক বছর কেটেছে, আর একটা বছর তো আছে মোটে! তারপর না-হয় একটা টেকনিক্যাল লাইনে ঢুকিয়ে দেওয়া যাবে।' আমি তার বাপের বন্ধু এবং বাইরের লোকও বটে, যেন বেশ একটু লজ্জা পেয়ে রমাপদ সেদিন চুপ ক'রে অধোবদন হয়ে আমার সদুপদেশ শুনল। পরদিন থেকে নিয়মিতভাবে ও পড়াশুনো করতে লাগল, কলেজে যেতে আরম্ভ করল। তারাপদ যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম।

জানুয়ারির মাঝামাঝি সেটা। ঠাণ্ডা লেগে শরীরটা একটু খারাপ হয়েছিল বলে দু দিন একেবারে বাড়ি থেকে বেরোই নি। তৃতীয় দিন সন্ধ্যার দিকে একটু গল্পসল্প করব মতলব ক'রে তারাপদর বৈঠকখানায় গিয়ে হাজির হতে দেখি, একলা মুখ ভার ক'রে তিনি চুপচাপ বসে আছেন। দেখেই মনে হল, তারাপদ ঐ অবস্থায় অনেকক্ষণ চুপ ক'রে বসে আছেন। কি ব্যাপার! অনেকক্ষণ জেরা করবার পর যা শুনলাম, তাতে হতবুদ্ধি হয়ে গেলাম। পরীক্ষার ফিজ দেবে বলে রমাপদকে তিনি যে টাকা দিয়েছিলেন, সেই টাকা নিয়ে রমাপদ বাড়ি থেকে পালিয়েছে। আজ দু দিন। কোথায় গেছে, কি বৃত্তান্ত, তারাপদ কিছুই জানতে পারছেন না। কেবল ফিজের টাকা নিয়ে নিবৃত্ত থাকে নি। তারাপদর হাত-বাক্সের তালা ভেঙে আরও শ' চার টাকা নিয়ে গেছে। দু হাতে মুখ ঢেকে তারাপদ কেঁদে উঠলেন। আমি অনেক ক'রে বন্ধুকে বোঝালাম। অল্প বয়েস ছেলের। রক্ত গরম। নিশ্চয় কোনও বদ

ছেলের উস্কানিতে পড়ে সে এই কর্ম করেছে। তা এ টাকায় ওর ক'দিন যাবে! দুনিয়ার ও কি দেখেছে! গেছে, ভালই হয়েছে। একটু ধাক্কা খাক। ঠোক্কর খেয়ে আবার এখানেই ফিরে আসবে। ও এমন কোনও একটা লায়েক হয়ে যায় নি যে, এখনই নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে পারবে।

আমার কথা ফলল। দেড় মাস পর খবর পেলাম, তারাপদর ছেলে বাড়ি ফিরেছে। শুনেই আমি তারাপদর বাড়ি গেলাম। তারাপদ দুঃখও করলেন, হাসলেনও। কি বিষয়—না, রমাপদ নাকি সোজা মাদ্রাজে চলে গিয়েছিল। সেখানে গিয়ে একটা শিপ-ইআর্ডে ঢুকতে চেষ্টা করেছিল। তার ইচ্ছা ছিল, জাহাজের কারখানায় চাকরি নিয়ে সেখানে থেকে ধীরে ধীরে জাহাজ চালানোও শিখে ফেলবে। প্রথমে সাধারণ নাবিক, পরে কাপ্তানের পদে যাবে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, সন্দেহ কি! কিন্তু শিপ-ইআর্ডে ঢোকা হল না এক ফিরিঙ্গি ছোকরার প্যাঁচে পড়ে। রমাপদকে যথাস্থানে ঢুকিয়ে দেবে বলে নানারকম লোভ দেখিয়ে ফিরিঙ্গিটা রমাপদর সব টাকা আত্মসাৎ করল। রমাপদ গোড়ার দিকে একটা হোটেলে উঠেছিল। সেখানেই ছেলেটার সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। টাকা নিয়ে সেই ছোকরা একদিন হাওয়া হতে রমাপদর চোখ খুলে যায়। তারপর আর কি! ক'দিন খেয়েদেয়ে রমাপদ যখন হোটেলওলার টাকা দিতে পারলে না, হোটেল থেকে তাকে বার ক'রে দেওয়া হল। রমাপদর তখন রাস্তায় দাঁড়ানোর অবস্থা। শেষটায় এক গুজরাতী ভদ্রলোক সব শুনে সদয় হয়ে কিছু টাকা দিয়ে নাকি রমাপদকে ক'লকাতায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। কাহিনী শেষ ক'রে তারাপদ মৃদু মৃদু হাসছিলেন: 'রীতিমত অ্যাডভেন্‌চার ক'রে ফিরেছে, কি বলেন!' শুনে আমি কতকক্ষণ গম্ভীর হয়ে ছিলাম। বস্তুত, ঐ কাহিনীর পিছনে কতটা সত্য ছিল, আসলে কি ঘটেছে এবং এতগুলি টাকা একসঙ্গে হাতে পেয়ে রমাপদ কোন্ দিকে পা বাড়িয়েছিল ইত্যাদি ভেবে কেন জানি আমার মনে গভীর সংশয় উপস্থিত হয়েছিল। অবশ্য তারাপদকে আমি সেসব কিছুই বললাম না। শুধু প্রশ্ন করলাম, এখন ছেলে বলছে কি? আবার কলেজে ঢুকবে? পরীক্ষা-টরীক্ষা দেবার মতলব আছে? তারাপদবাবু আমার কানের কাছে মুখ এনে বললেন, 'না—আমার মাথায় অন্যরকম প্ল্যান এসেছে। আর কলেজ-কলেজ না।' আমি ফ্যালফ্যাল্ ক'রে বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে সব শুনলাম। হাঁ-না কিছু বললাম না। কথা শেষ ক'রে তারাপদ বললেন, 'বড়সাহেবকে আমি অলরেডি সাউণ্ড করেছি। আশাও পেয়েছি।

দুটো পয়সা নিজের হাতে হাতাবে এবং এদিক থেকেও একটু-একটু দায়িত্ব-বোধ জাগবে। ঠিক হয়ে যাবে—আমার তো মনে হয়, চাকরি এবং বিয়ে একসঙ্গে ওকে পাইয়ে দিলে মতিগতি ফিরবে। শত হ'ক মধ্যবিত্ত ঘরের বাঙালী ছেলে তো! তাই নয় কি?' মৃদু মস্তক সঞ্চালন ক'রে সম্মতি দেওয়া ছাড়া হঠাৎ সেদিন আমার আর কিছু করার ছিল না। কিন্তু আমি জানতাম, বৌ পেয়ে, যেমন-তেমন চাকরি নিয়ে তারাপদর পুত্র সন্তুষ্ট থাকবে না। কেরানী হয়ে থাকা সে চাইত না। জানি না, কথাটা তখনকার মত তারাপদবাবু ভুলে গিয়েছিলেন কিনা।

বোধ করি, হুট ক'রে এত অল্প বয়সে বিয়ের কথা শুনে রমাপদ নিজেও তার উচ্চাকাঙ্ক্ষার কথা ভুলেছিল। দেখলাম, তাই হল। দিব্যি অফিসে যেতে লাগল। এদিকে বেশ খরচপত্র ক'রে তারাপদ রমাপদর বিয়ে দিলেন। রমাপদ দেখতে খুবই সুশ্রী; কিন্তু দেখা গেল, বৌটি আরও সুশ্রী, আরও বেশী সুন্দর। বিয়ের পর পুরো একটা বছর তো অফিস আর বাড়ি, বাড়ি আর অফিস ছাড়া রমাপদকে আমরা কেউ ডাইনে-বাঁয়ে তাকাতে, কি একটু সময়ের জন্যে বাড়ির বারান্দায় এসেও কোনও বন্ধুর সঙ্গে গল্প করতে দেখি নি। সব দেখে-শুনে তারাপদ আমাদের দিকে তাকিয়ে মৃদু মৃদু হাসতেন। অর্থাৎ তাঁর মনের ভাব ছিল—কেমন হল তো! আধারে না পুরলে পারদ ছড়িয়ে-ছিটকে যাবেই, হাজারটা পা মেলে চঞ্চল হয়ে ছুটোছুটি করবে! ইংরেজীতে সেজন্যেই এর নাম দিয়েছে 'কুইক সিল্‌ভার'। মানুষের প্রথম যৌবনও তাই। যথাস্থানে একে আটকে না রাখলে বিপদ ঘটে।

ভাল, মনে মনে রমাপদর সুখী জীবন কামনা ক'রে আমরাও নিশ্চিন্ত হলাম। কিন্তু অনেকের জীবনেই সুখ সহ্য হয় না। রমাপদর কথা বলছি না। সে তার সুখের জীবন খুশিমত হয়তো বেছে নিয়েছিল। অপার দুঃখে নিমজ্জিত হলেন তারাপদ। দু মাসের পাওনা ছুটি নিয়ে আমি সেবার বাইরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ছুটির শেষে ক'লকাতায় [illegible]তে না-দিতে তারাপদ আমাকে তাঁর বাড়িতে ডেকে নিয়ে গেলেন। কি ব্যাপার! রমাপদ চাকরি ছেড়ে দিয়েছে। চাকরি ছেড়েছে বলে তারাপদ দুঃখ করলেন না। বাড়িঘর পর্যন্ত ছেড়েছে। কোথায় আছে, কি করছে [illegible] করবার আগেই তারাপদ যা বললেন, শুনে আবার স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। রমাপদ টালিগঞ্জে আছে এক বন্ধুর বাড়িতে। বন্ধুটি বড়লোকের ছেলে এবং বিষবখাটে। বন্ধু পরামর্শ দিয়েছে, কেরানীগিরি রমাপদর লাইন নয়। পৃথিবীতে করবার,

বাচবার অনেক ভাল ভাল পথ খোলা আছে। কোথায়, কবে, কি ক'রে সেই বন্ধু রমাপদকে জপিয়েছে, তারাপদ সেসব সংবাদ কোন দিন পান নি। তিনি শুধু লক্ষ করতেন, রমাপদ আবার কেমন অন্যমনস্ক হয়ে উঠেছে। অফিসে তো যাচ্ছেই না, বাড়িতেও খুব কম থাকে। বৌমাকে দু-একটা প্রশ্ন ক'রে তারাপদ শুধু এইটুকু জানলেন, রমাপদ নাকি কি একটা ব্যবসা করার ফিকিরে আছে। টাকার সন্ধানে ঘোরাঘুরি করছে। এক বন্ধু কিছু টাকা দেবে। কিন্তু তা যথেষ্ট নয়, আরও টাকার দরকার। সারা দিনের মধ্যে তারাপদ ছেলের দেখা পেতেন না। হয়তো তিনি যখন ঘুমিয়ে পড়তেন, অনেক রাত্রে রমাপদ বাড়ি ফিরত। তখন ছেলেকে ডেকে এসব কথা জিজ্ঞাসা করার সময়ও হত না এবং তাঁর মেজাজও থাকত না। এক রবিবার সকালে তারাপদ বাজারে গিয়েছিলেন, বেশ বেলা ক'রে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন, রমাপদ তখনও ঘুমোচ্ছে। বৌমাকে প্রশ্ন ক'রে জানতে পারলেন, রাত দুটোর সময় রমাপদ বাড়ি ফিরেছিল। তারাপদ সেদিন সোজাসুজি ছেলেকে প্রশ্ন করলেন, বিষয় কি? রমাপদ জানাল, তার এখন কিছু টাকার দরকার এবং ব্যাঙ্কে তারাপদবাবুর যে টাকাটা আছে, তা তিনি তুলে দিতে রাজি আছেন কিনা। ভাল একজন পার্টনার পেয়েছে এবং সে তার টাকাও দিয়েছে, কিন্তু রমাপদ তার অংশের টাকাটা দিতে পারছে না বলে অত্যন্ত লজ্জিত আছে। কিসের ব্যবসা করা হবে প্রশ্ন করার পর তারাপদ যা শুনলেন, তাতে তাঁর চক্ষু চড়কগাছে উঠল। রেসের ঘোড়া কেনা হচ্ছে। একটা আফগানী জলের দরে তার ঘোড়া দুটো বিক্রি ক'রে দেশে চলে যাচ্ছে। লোকটা একটা খুনের মামলায় পড়েছে। তাই রাতারাতি এখান থেকে পালাবার মতলব। খুব গোপন সূত্রে সংবাদ পাওয়া গেছে। কিছু টাকা দিতে পারলেই রাতারাতি তার চতুর্গুণ রিটার্ন আসে। তৈরী ঘোড়া। এর পিছনে টাকা ঢাললে মার নেই। রমাপদ তার বন্ধুর সঙ্গে গিয়ে নিজের চোখে ঘোড়া দুটো দেখে এসেছে। সেজন্যই কাল বাড়ি ফিরতে এতটা রাত হল। তারাপদ সেদিন ঘাড়ে ধরে ছেলেকে রাস্তায় বার ক'রে দিতেন; কিন্তু পারলেন না—বৌমা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। সেটাই তাঁর ভুল হয়েছে। বৌমা হয়তো রমাপদর জন্যে ভাবত; কিন্তু রমাপদর মনে যে তার স্ত্রী সম্পর্কে এক তিল স্নেহ-মমতা-ভালবাসা ছিল না, ঐ ঘটনার পাঁচ-সাত দিন পর তারাপদবাবু ভাল হাতে তার প্রমাণ পেলেন। সেদিন তারাপদ বেশ কড়া সুরে জানিয়ে দিয়েছিলেন, এসব ব্যবসা করতে হয়, রমাপদ বাইরে

থেকে টাকা যোগাড় ক'রে করুক—তিনি একটি আধলা দিয়েও সাহায্য করবেন না। রমাপদ সেই যে বাড়ি থেকে বেরোল, ক'দিন আর ফিরল না। এদিকে রমাপদর স্ত্রী খুব কাঁদাকাটি করছিল এবং তারাপদ মনে মনে ভাবছিলেন, খোঁজখবর নিয়ে ছেলেকে ডেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনবেন কিনা। কিন্তু তার আগেই একদিন রমাপদ এসে হাজির। অবশ্য কত রাত ক'রে সে বাড়িতে ঢুকেছিল, সেদিনও তারাপদবাবু টের পান নি। টের পেলেন পরদিন সকালে। হাতমুখ ধুয়ে ঘরে ঢুকে তিনি বৌমাকে ডাক-ছিলেন চা দিতে। তাঁর গলার আওয়াজ শুনে বৌমা দরজা খুলে বেরিয়ে এসে তারাপদবাবুর পায়ের কাছে আছাড় খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। বিমূঢ় বিস্মিত তারাপদবাবু কোনমতে নিজেকে সামলে নিয়ে পুত্রবধূর হাতে ধরে তাকে মাটি থেকে উঠিয়ে সান্ত্বনা দিয়ে একটি-একটি প্রশ্ন ক'রে যখন সব জানতে পারলেন, তিনি প্রতিজ্ঞা করলেন, রমাপদকে আর এ বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হবে না। ছি, ছি! ভদ্রসমাজের কোন ছেলে এই ধরনের কাজ করতে পারে, তারাপদ স্বপ্নেও ভাবেন নি। রমাপদ স্ত্রীর সব গয়না সমেত তার হাতবাক্সটি চুরি ক'রে পালিয়েছিল। তখনই রমাপদকে পুলিসে দেবার ব্যবস্থা করা উচিত ছিল। কিন্তু লোকলজ্জার ভয়ে তারাপদ সেদিন সেটা করতে সাহস পান নি, আমরা বেশ বুঝতাম। অবশ্য তারপর আর একদিনও রমাপদ বাড়ি আসে নি। তারাপদবাবু তো না-ই, রমাপদর স্ত্রী পর্যন্ত স্বামীর কথা আর ভুলেও মুখে আনত না। তারাপদ সব বলতেন আমাকে। হ্যাঁ, একটি মেয়ে হয়েছিল রমাপদর। নাতনির চেহারা অবিকল মার মতন—রমাপদর মুখের আদল প্রায় ছিল না বলে তারাপদবাবু সুখীই হয়েছিলেন। রমাপদকে যে তিনি কতটা ঘৃণা করতে আরম্ভ করেছেন, তা থেকেই তখন বোঝা গেছে। এবং নাতনি ও পুত্রবধূকে নিয়ে তারাপদ আবার নতুন উদ্যমে সংসার বাঁধছেন, দেখতাম। পৈতৃক সম্পত্তি কিছুটা পেয়েছিলেন এবং নিজেও তিনি ভাল চাকরি করতেন রেলে। প্রভিডেণ্ট ফণ্ডের মোটা টাকা হাতে নিয়ে তিনি আর মাস পাঁচ-ছয় পরেই চাকরি থেকে অবসর নিলেন। বালিগঞ্জে জায়গা কিনলেন এবং বেশ খরচপত্র ক'রেই নতুন বাড়ি করলেন। আমরা—তারাপদর বন্ধুরা—অনেক সময় নিজেদের মধ্যে কানাঘুসা করেছি। রমাপদ বলতে গেলে একরকম ত্যাজ্যপুত্র হয়ে বাইরে বাইরে আছে। উচ্ছৃঙ্খল অধঃপতিত সন্তান। কিন্তু গোড়ায় যেমন তারাপদর চোখে-মুখে একটা ক্লেশ লেগে থাকত, এদিকে আর সেটা আমাদের চোখে পড়ত না। বরং

দেখতাম, অধিকতর উৎসাহ, উদ্যম এবং যেন এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুখস্বপ্ন নিয়ে নাতনির হাত ধরে ঘুরে ঘুরে বাড়ির দরজা-জানলায় রং করিয়েছেন, বাগানে মালিদের কাজের তদারক করেছেন, ক্লান্ত হলে বারান্দায় উঠে এসে তারাপদবাবু ইজি-চেয়ারে গা ঢেলে দিয়ে আরামে চোখ বুজেছেন। বৌমা তখন শ্বেতপাথরের গ্লাসে শরবত নিয়ে শ্বশুরের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। না, এ পক্ষ থেকে স্নেহ-মমতা ও ভালবাসার যেমন অন্ত ছিল না, তেমনি ও পক্ষ থেকেও শ্রদ্ধা-ভালবাসা সেবা-যত্ন প্রস্রবণের ধারার মত অবিরত বইছিল। দেখে আমরা মুগ্ধ হয়েছি। মনে হত না, কারও মনেই পড়ত না, এখানে একজন অনুপস্থিত। রমাপদ নেই—খুকির বাবা, তারাপদর পুত্র, বৌমার স্বামী। কতখানি অবাঞ্ছিত হলে জীবিত একটা মানুষকে প্রায় অস্বীকার ক'রে দিনের পর দিন কাটানো নয় শুধু সুন্দরভাবে, স্বাভাবিকভাবে বেঁচে থাকা যায়, তারাপদবাবুর সংসার দিয়ে আমরা মনে মনে তার পরিমাপ করেছি এবং বিস্মিতও হয়েছি।

তা ছাড়া দিন-দিন রমাপদ নিচের দিকে এমন দ্রুত নামতে শুরু করেছিল যে, স্বামী বা পুত্র হিসাবে তাকে অস্বীকার ক'রে থাকা তাদের পক্ষে স্বাভাবিক তো বটেই, নিরাপদও ছিল। রমাপদর দুষ্কৃতির সংবাদ অহরহ আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে। মিথ্যা বলতে ত্রিভুবনে তার জুড়ি কেউ আছে কিনা, আমাদের সন্দেহ হত। প্রথম যৌবনে বাপের ক্যাশ-বাক্স ভেঙে টাকা চুরি ক'রে জাহাজের কাপ্তান হওয়ার বাসনায় বিদেশযাত্রা ও পরে স্ত্রীর গায়ের অলংকার চুরি ক'রে রেসের ঘোড়া কিনে বড়লোক হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষা শেষ পর্যন্ত কোথায় গিয়ে পৌঁছেছিল, একটি ঘটনা থেকেই তা বোঝা গেছে। অনাদি সেন। আমার এবং তারাপদবাবুরও বন্ধু বটে। অসুস্থ হয়ে অনেক দিন তিনি শয্যাশায়ী থাকার দরুন তারাপদবাবুর পরিবার সম্পর্কে তেমন একটা খোঁজখবর রাখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অনাদিবাবু উদার ও পরোপকারী বলে আমাদের মধ্যে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। সাহায্য চেয়ে কেউ তাঁর কাছ থেকে বিমুখ হয়ে ফিরেছে, আমরা কোনও দিন শুনি নি। রমাপদ সেই ভালমানুষ অনাদি সেনের বদান্যতার সুযোগ নিলে। মেয়ের অসুখ, বাবার এবং তার নিজের হাত-টান যাচ্ছে, তা ছাড়া অসুখটা একটু খারাপ রকমের, ডাক্তারে-ওষুধে ইতোমধ্যে হাজার দুই খরচ হয়ে গেছে, এখন রেডিয়ম ট্রিট্‌মেণ্ট হবে, শহরের নাম-করা একজন স্পেশ্যালিস্টকে দেখানো হয়েছে, সুতরাং আজ সন্ধ্যার মধ্যেই আবার সাত-আট শ' টাকা দরকার ইত্যাদি বলে রমাপদ অনাদি-

বাবুর কাছ থেকে দিব্যি চেক্ লিখিয়ে নিয়ে আসে। অনাদিবাবু অবশ্য এর দিন দুই পরে প্রকৃত ঘটনা জানতে পারেন। কিন্তু তখন আর রমাপদকে তিনি কোথায় পান! সব শুনে লজ্জায়, দুঃখে তারাপদবাবু অনাদিবাবুর সঙ্গে দেখা করতেই যেতে পারেন নি। পত্র লিখে ক্ষমা চেয়ে তিনি অনাদি সেনের টাকাটা অবশ্য শোধ করলেন, আর সেই সঙ্গে তাঁর বন্ধুবান্ধব এবং জানাশোনা সবাইকে জানিয়ে দিলেন, রমাপদকে যেন কেউ টাকা ধার না দেয়, রমাপদ তাঁর সঙ্গে থাকে না, এমন কি নিজের স্ত্রী-কন্যার সঙ্গেও বহুকাল তার কোনরকম সম্পর্কই নেই।

কিন্তু তা বলে কি আর রমাপদর টাকার অভাব হত! কোথা থেকে কি ক'রে সে টাকা যোগাড় করছে, সব সংবাদ আমরা পেতাম না; তবে এইটুকু শুনতাম, সে নাকি এই শহরেই আছে এবং বন্ধুবান্ধব নিয়ে আমোদ-ফুর্তিতে দিন কাটাচ্ছে। কেবল পুরুষ না, মেয়ে বন্ধুও রমাপদ অনেক জুটিয়েছে ইত্যাদি কুৎসিত ধরনের সংবাদও আমাদের কানে অনেক আসত। কিন্তু সেসব আমরা, তারাপদবাবু তো নয়ই, গায়ে মাখতাম না। উচ্ছৃঙ্খল ও অসৎচরিত্র রমাপদর ভাল হবার, সংসারে ফিরে আসার সকল আশা আমরা বাদ দিয়ে রেখেছিলাম। কবে মদ খেয়ে মত্ত অবস্থায় কাকে গাড়িচাপা দিয়ে জেলে যেতে যেতে বেঁচে গেছে, কবে এক বড়লোক পাঞ্জাবী বন্ধুর স্ত্রীর গলার দামী হার ছিনিয়ে নিয়ে মাস ছয় গা-ঢাকা দিয়ে আবার একদিন বেরিয়ে ভালমানুষ সেজে এর-ওর কাছে ব্যবসা-বাণিজ্য করবে বলে টাকা চাইতে আরম্ভ করেছে, সেসব কাহিনী বলতে গেলে একটি মহাভারত হবে। তবে এইটে ঠিক, অধঃপতনের শেষ সীমায় পৌঁছেও নাকি রমাপদ বড় আশা, বড় কথা ছাড়া কথা বলত না। এবং এই ক'রে ক'রে সে তার দিনগুলি সুখেই কাটাচ্ছিল। 'ডেভিল!' তারাপদবাবু আমাকে অনেক দিন বলেছেন, 'সংসারে এদের মার নেই। যারা সৎপথে থাকে, দুঃখ তাদের জন্যে।' বস্তুত, শেষ পর্যন্ত তারাপদবাবুর কথাই ফলল কিনা, আজ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি তাই ভাবছিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর তারাপদ চাকরকে ডাকলেন। চাকর এসে আমার পরিত্যক্ত শূন্য চায়ের পেয়ালাটা সরিয়ে নিয়ে গেল। মশলার থালা থেকে একটা লবঙ্গ মুখে তুলে ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলাম, 'বৌমা কবে ফিরবেন? খুকুর শরীর ভাল আছে ওখানে? কিছু খবর পেয়েছেন?'

যেন আমার কথা তাঁর কানে গেল না। চারদিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে কেমন যেন ভয়ে ভয়ে অত্যন্ত নিচু গলায় তারাপদবাবু বললেন, 'কয়েকদিন আগে রমাপদ বাড়ি এসেছিল।'

'এসেছিল!' রুদ্ধস্বরে বললাম, 'অনেক দিন পর—কি ব্যাপার? মতিগতি ফিরেছে বলে মনে হল কি?'

'একটা সিনেমা কোম্পানি খুলেছে।' স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে ছোট একটা নিশ্বাস ফেললেন তারাপদ। 'অনেক টাকা-পয়সা খরচ ক'রে কি একটা নাম-করা বই করছে, বলল এসে।'

'তাই বলুন।' এবার আমি বুকভাঙ্গা হাসি হাসলাম। 'নিশ্চয় টাকার জন্যে এসেছিল! আপনি 'না' ক'রে দিয়েছেন তো?'

একটু চুপ থেকে তারাপদ বললেন, 'না, আমি টাকা দিই নি—আমার কাছে এবার সেসব কিছু চায় নি।'

'তবে?' নির্নিমেষ চোখে তারাপদকে দেখছিলাম।

'ডেভিল!' ক্লান্ত চোখ দুটো মেঝের দিকে নামিয়ে তারাপদ যেন জোর ক'রে একটুখানি হাসলেন। 'শয়তানের পয়সা শয়তানে জোটায়, এ তো আর আপনার অজানা নেই, শশধরবাবু! কে টাকা দিচ্ছে, আমি জিজ্ঞেসও করি নি।'

'ভাল করেছেন।' ইতস্তত না ক'রে আমি প্রশ্ন করলাম, 'ওর উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আমরা যাকে 'অ্যাম্বিশন' বলতাম, এতদিনে তা হলে পূরণ হচ্ছে! তুষ্টু এখানে এসেছিল কেন?'

'তাই বলব বলেই আপনাকে মনে মনে ক'দিন ধরে খুঁজছিলাম, শশধরবাবু। আপনাকে তো আজ অবধি কিছু গোপন করি নি!' তারাপদর চোখের কোণায় আবার জল এসেছে।

'না, তা তো করেন নি।' অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে বললাম, 'দীর্ঘদিন ছিলাম না এখানে, তাই ছুটে এসেছি, জানতে চাইছি—কেমন আছেন, আপনার খবর কি!'

বস্তুত, আমি ভেবে পাচ্ছিলাম না, এতকাল পর বাড়ি ফিরে রমাপদ আবার কি আঘাত দিয়ে গেছে বাপকে, কি সর্বনাশ ও করল! দেওয়ালের দিকে চোখ ফিরিয়েছিলেন তারাপদ। সেদিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, 'আপনি ঠিক বলেছেন, ওর অ্যাম্বিশন এবার ষোলকলায় পূর্ণ হল।'

আমার মুখে কথা আসছিল না। প্রকাণ্ড একটা ঢোঁক গিললাম শুধু।

তারাপদ বললেন, 'এসে আমাকে নয়, বৌমাকে বলল, নাম-করা বইএর ছবি তোলা হচ্ছে, হিরোইনের পার্ট নিতে হবে বিভাকে—রূপের দিক থেকে বিচার ক'রে তার চেয়ে সুন্দরী মেয়ে রমাপদ এই শহরে আর কাউকে খুঁজে পাচ্ছে না।'

কেমন স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। কতক্ষণ নীরব থেকে পরে সামলে নিয়ে মৃদু হেসে প্রশ্ন করলাম, 'কি বললেন বৌমা? বিভা শেষ পর্যন্ত কি বলে বিদায় করলেন হতভাগাটাকে?'

'রাজি হয়েছে।' টেবিলের উপর দুটো হাত রেখে তার মধ্যে তারাপদ মাথা গুঁজলেন। 'আজ ছ দিন হয় দুটিতে চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। খুকুটা ভয়ানক কাঁদাকাটি করছিল। শিলিগুড়িতে ওর মামাবাবুর কাছে পাঠিয়ে দিয়েছি।'

যেন কি একটা সুন্দর গন্ধ আসছিল। অনেকক্ষণ গাঢ় নিশ্বাস নিয়ে পরে টের পেলাম, বাইরে তারাপদর বাগানে হাস্নাহানা ফুটেছে।

নিষ্ঠুর

দুই বন্ধু।

আশ্চর্য! একদিন অদ্ভুতভাবে দেখা হল তাদের। কতদিন পর কতকাল পর।

একজন দোকানে পাঁউরুটি কিনছিল, আরজন সিগারেট। কমলেশ বলল, 'কোথায়, কত নম্বর? অ, সেই লাল জাহাজ প্যাটার্নের বাড়িটা! বুঝেছি, অঘোরবাবুর বাড়ি। তা, সে তো অনেক ভাড়া, অবশ্য—অবশ্য বাড়ি খুব ভাল।' বলে কমলেশ হঠাৎ চুপ ক'রে গেল।

দীপক প্যাকেট খুলে একটা সিগারেট বন্ধুকে দিলে। নিজে একটা মুখে গুঁজলে, তারপর দোকানের দড়ি থেকে সিগারেট ধরিয়ে বন্ধুরটাও ধরিয়ে দিলে।

'তারপর তুমি!' একরাশ ধোঁয়া নাক দিয়ে, মুখ দিয়ে বার ক'রে দিয়ে খুশী চোখে দীপক বন্ধুর দিকে তাকায়। 'তুমি এ পাড়ায় নিশ্চয় অনেক দিন? সবাইএর নামটাম জান, দেখছি! কোথায়? এই গলির পাশের গলিতে? বাড়ির নম্বর কত? কি মুশকিল, সাহিত্যিক কমলেশ চক্রবর্তীর পাশে এসে গেছি আমি!'

কমলেশ কথা না কয়ে ডান হাতের পাঁউরুটি বা হাতে চালান দিয়ে বন্ধুর হাত চেপে ধরল। 'পয়সা-টয়সা করেছ, বড় ডাক্তার হয়েছ, শুনেছি। কোথায়, কেমন ঘর—চল, দেখি। তোমাকে দেখলাম, এই বেলা মিসেসকে দেখাও।'

দীপক হাসতে লাগল।

'নিশ্চয় দেখাব, এস।' বন্ধুর হাত ধরে সে দোকানের দরজার বাইরে এল।

'উঃ, কতকাল পর দেখা! কতদিন পর! অদ্ভুত ভাল-ভাল গল্প লিখছ, শুনছি, শুনি—সবাই বলে।'

'অ, নিজে পড়ে বলছ না—শুনছ?' কমলেশ একটা নিশ্বাস ফেলার শব্দ ক'রে হাসল। 'যাক গে, তোমরা কাজের লোক—আমার গল্প পড়ার যে সময় নেই, জানি। মিসেস পড়েন নিশ্চয়! কিন্তু এ কি?'

'কি হল?'

রাস্তায় না নেমে কমলেশকে দোকানের বারান্দায় আবার থেমে যেতে দেখে

দীপক বলল, 'কিছু ফেলে এলে কি ?, না, তোমার কিছু আরও কেনার-বাকি রইল ?'

'তাই আমি জিজ্ঞেস করছি তোমাকে। শুধু যে এক প্যাকেট সিগারেট কিনে বাড়ি ফিরছ ? লজেন্স্ নিলে না কেন ? বিস্কিট, চকলেট, অস্ট্রেলিয়ান কর্ন, পটেটো চিপ্স বা ঐ জাতীয় একটা কিছু ? আমাদের ল্যান্স্ডাউন রোডের সবচেয়ে নামজাদা টফিবিক্রেতা এরা, এও তোমায় বলে রাখছি।'

ডাক্তারের চোখের দিকে তাকিয়ে সাহিত্যিক দুষ্টু হাসল। দোকানের শো-কেসটা ঘাড় ফিরিয়ে আর একবার দেখা শেষ ক'রে দীপকও হাসল। আড়চোখে বন্ধুর হাতের পাঁউরুটির দিকে চেয়ে বলল, 'তোমাকে বুঝি সকালবেলা দোকানে ছুটে আসতে হয় ছানার আহার কিনতে ? ক'টি ?'

'একটি। না, পাঁউরুটি বাচ্চার জন্যে নয়—আমার। আগে নিজের চা খাওয়া সারি -তারপর, তারপর কোমর বেঁধে লাগি। সংসারধর্ম পালনে। বাচ্চার জন্যে চকলেট-পাঁউরুটি নয়, বার্লি; বাচ্চার মার জন্যে পুঁইশাক আসে না—ডিস্পেপসিয়ায় ভুগছেন—হিঞ্চে শাক। কাছে এসেছ এখন - দেখতে পাবে, একজন সাহিত্যিককেও দোকানে-বাজারে ছুটোছুটি করতে হয় দিনে দশবার। হা—হা!' কমলেশ টেনে টেনে হাসে। 'শুধু গল্প লিখেই লেখক খালাস পায় না!'

দীপক একবার গম্ভীর হল।

বন্ধুর হাতে চাপ দিলে কমলেশ।

'তারপর তোমার ? বল, বল—ক'টি হল ? ক'বছর বিয়ে হয়েছে ? নাকি এখন পর্যন্ত একটিও মিসেস তোমাকে উপহার দেন নি ?'

'এইবেলা দেবেন, দেব-দেব করছেন।' দীপক অল্প হাসল।

'গুড! তাই তো তোমায় জিজ্ঞেস করছি!' সাহিত্যিক হাল্কা গলায় হাসল। 'বেশ, এইবেলা মিসেসকে দেখাও। বাব্বা, কতকাল পর দুজনের দেখা হল, বল তো!'

'কত ছোটবেলায় ছাড়াছাড়ি হয়েছি!' ডাক্তার সিগারেটের টুক্‌রোটায় শেষ টান দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

'তোমার চেহারা আগের চেয়ে ঢের ভাল হয়েছে।' কমলেশ ডাক্তারের দেখাদেখি সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে সেটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে। 'মাসে কত রোজগার হচ্ছে, শুনি ?'

যেন কথাটা কানে যায় নি, কি ইচ্ছা ক'রে দীপক শুনল না। 'তোমার প্রশংসা শুনে কানে তালা লাগছে হে! আধুনিক গল্পলেখকরা নাকি ঈর্ষা করছে; পাঠকপাঠিকারা, শুনলাম, জানতে চাইছে, দেখতে চাইছে, তুমি কে, তুমি কেমন, কোথায় আছ, কি খেতে ভালবাসছ, কি পোশাকপরিচ্ছদ তোমার, কখন লেখ, রাত্রে কি দিনে?'

'হবে।' যেন সকলের প্রশংসাটা ইচ্ছা ক'রে সাহিত্যিক গায়ে মাখল। গম্ভীর হয়ে বলল, 'যারা আমার গল্প পড়ে, আমাকে বড্ড বেশী জানতে চায়, তারা দেখতে চায়।'

'চাইবেই তো, চাওয়া উচিত! শিল্পীকে সবাই ভালবাসে।' খুশী-চোখে দীপক যখন বন্ধুর দিকে তাকায়, কমলেশ আকাশ দেখে। রুক্ষ, ঝাঁকড়া একমাথা চুল। ময়লা পাঞ্জাবি গায়ে।

'এই বাড়ি।'

দীপক লাল বাড়ির সামনে দাঁড়ায়। সাহিত্যিকও দাঁড়ায়। সুন্দর সিঁড়ি। সবুজ ঘাসরং গালিচা বিছানো। দু ধারে ফুল-পাতাবাহারের টব।

সবুজ স্ক্রিন ঝুলছিল দরজায়।

শরতের কোমল রৌদ্র বুকে নিয়ে জানলার পরদা কাঁপছিল। সাহিত্যিক লক্ষ করল।

মানুষের পায়ের শব্দে একটা খরগোশ এদিক থেকে ওদিকে ছুটে পালাল। খাঁচায় ময়নাটা তারস্বরে কথা কয়ে উঠল। একটা হলদে প্রজাপতি কমলেশের কানের পাশ দিয়ে উড়ে গিয়ে আর একটা টবে বসল।

দীপক চিৎকার ক'রে অস্থির গলায় ডাকল, 'করবী!'

ঘর থেকে, না বাগান থেকে ছুটে এল নারী।

করবীফুলের মত নাতিদীর্ঘ শরীর। সেই রং, বিভা, শ্রী, নিটোল পরিচ্ছন্ন একটি হাসি। হাতে মাটি।

করবী ফুলগাছের গুঁড়িতে মাটি দিচ্ছিল কি? কমলেশ ভাবল। কমলেশ যখন ভাবছিল, ডাক্তার পরিচয় করিয়ে দিচ্ছিল।

'আমার বন্ধু, বিখ্যাত গল্পলেখক কমলেশ চক্রবর্তী। আমার সহধর্মিণী শ্রীমতী করবী।'

'তা বুঝেছি, তা কি আর বুঝতে দেরি লাগে!' সুন্দর হেসে কমলেশ যুক্তকর কপালে ঠেকায়। 'ভারি ছোটবেলা থেকে আমরা বন্ধু!' করবীর চোখে কমলেশের চোখ।

'নমস্কার!' যেন চাপা একটা নিশ্বাস ফেলল করবী। 'আমি আপনার গল্প পড়েছি।'

সাহিত্যিকের চোখের দিকে তাকিয়ে করবী আগের চেয়েও সুন্দর ক'রে হাসল।

'আমার কোন্ গল্প পড়েছেন?'

সাহিত্যিকের কাঁধে হাত রাখল ডাক্তার?

'ভিতরে চল। একসঙ্গে বসে দুজন চা খাব। আজ সকালে তোমার সঙ্গে এমনভাবে হঠাৎ দেখা হবে, স্বপ্নেও ভাবি নি।'

'চল।' সাহিত্যিক ডাক্তার বন্ধুর দিকে ঘাড় ফেরায়। 'আমিও অবাক হয়ে গেলাম, তুমি এখানে!'

আর একজন কোন কথা কইল না। শুধু স্ক্রিনটা ধরে একটা দোলানি দিয়ে আগে আগে ভিতরে চলে গেল।

দীপক ত্রস্ত হাতে পরদা ঠেলে দিয়ে ডাকল, 'এস।' বন্ধুকে কমলেশ নিঃশব্দে অনুসরণ করল।

বাইরে যতটা মুখর ছিল, ভিতরে এসে কি আর তত কথা বলতে পারল দুজন! যেন কমলেশের চেয়েও দীপককে গম্ভীর দেখাতে লাগল।

'আমি জানি, খুব বেশীক্ষণ আমাকে নিয়ে চা খাওয়া ও গল্প করা তোমার হবে না।'

'কেন বল দিকি নি?'

দীপক জানলার আর দুটো পাল্লা খুলতে ব্যস্ত ছিল। ভোরের সবটা হলুদে রোদ এসে কেন ঘরে ঢুকছে না, ভাবছিল কি ডাক্তার?

ঘরে ঢুকেই বন্ধুর ব্যস্ততার ভাব লক্ষ ক'রে কমলেশ বলল, 'ডাক্তারমানুষ, এখুনি হয়তো একটা কল আসবে!'

'এসে গেছল।' দীপক বলল, 'ব্রাদার, কাল রাত দুটোয় বাড়ি ফিরেছি। কলেরা কেস ছিল। কোথায় সেই টালা! ভোরবেলা ঘুমোব, ভাবলাম। না, ঘরের কোণা থেকে তোমাদের এ পাড়ার মিসেস কিরণ রায় টেলিফোন করছিলেন, তাঁর খুকির দাঁতব্যথা, এক্ষুনি যেন যাই।'

'গেলে?'

'ছোঃ!' ডাক্তার প্যাকেট থেকে সিগারেট তুলে বন্ধুকে দিয়ে নিজে ধরালে। 'করবী আচ্ছা শুনিয়ে দিয়েছে মহিলাকে। দাঁতব্যথার জন্তে এই

অসময়ে ভদ্রলোকের ঘুম ডিস্টার্ব করার কোন মানে হয় না। সকাল সাতটায় শহরের দেঁতো ডাক্তারদের চেম্বার খোলা পাবেন। অনেক ডেন্টিস্ট হাঁ ক'রে বসে আছে দাঁত তুলতে, দাঁত বসাতে।'

কমলেশ গম্ভীর হয়ে গেল।

নেম-প্লেটে ডাক্তারের গুরুগম্ভীর টাইটেলগুলো সে দেখেছে বইকি!

স্যালাইন, অক্সিজেন, মেজর অপারেশনের কেসে ডাক পড়ে এঁদের। দাঁতব্যথায়, ফিক্‌ব্যথায় নয়।

'কিরণ রায় স্মল কজ কোর্টের উকিল।' সাহিত্যিক অল্প হাসল। 'এ পাড়ার সবাইকে তো আমি জানি!'

দীপক ঠোঁট গোল ক'রে সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং করল পর-পর দুটো।

একটু চুপ থেকে আস্তে আস্তে তেমনি গম্ভীর গলায় সে বলল, 'জরুরী কেস ছাড়া করবী আমাকে বেরুতে দিচ্ছে না।'

'কেন দেবে?' সাহিত্যিক সোফার উপর পা তুলে বসল। 'তোমার স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখতে হবে না?'

'বস্তুত, ডাক্তারের জীবন একটা জীবনই না!' দীপক সোফার গায়ে পিঠ এলিয়ে দিলে। 'বড্ড বিজি, বড় বিশ্রী!'

সিলিংএর দিকে চোখ রেখে সাহিত্যিক বলল, 'তা সত্যি, তা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু পয়সা আছে তো! ব্রাদার, দু হাতে রোজগার করছ দেখে হিংসা হচ্ছে!'

'কোথায় আর পয়সা!' দীপক সিলিংএর দিকে চোখ রাখল। 'তার চেয়ে পরিশ্রম বেশী। তার চেয়ে—না, কোথায় নিজের ঘরে বসে আরামে চা-সিগারেট খেতে খেতে তোমাদের মত সুন্দর মিষ্টি সব প্রেমের গল্প লিখব—না, রাত জেগে কলেরা কেস অ্যাটেণ্ড করব, ক্লোরোফর্ম করতে হবে, গ্যাংগ্রিন্ কেস এসেছে। এই মুহূর্তে পাটা কেটে শরীর থেকে বাদ দিয়ে দাও।'

সাহিত্যিক ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে চুপ ক'রে রইল।

'বুঝলে ব্রাদার, ডাক্তার-জীবন একটা জীবনই নয়! রাতদিন ছুরিকাঁচি আর ছুঁচ বেঁধাবার নিষ্ঠুরতা ভোগ, তার উপর রাত জাগা, আহার-বিশ্রামের আশাবর্জিত একটি দিন অতিক্রম ক'রে আর একটি দিনের জন্যে প্রস্তুত হওয়া—বড় ক্লান্তিকর, বড্ড অসুখের জীবন! পয়সা—পয়সা কি সব?'

ফুরফুরে হাওয়া আসছিল জানলা দিয়ে।

হলদে একটুকরো রোদ দেখে কমলেশের ভ্রম হচ্ছিল, বুঝি সেই প্রজাপতিটা।

'তোমার মিসেস গেলেন কোথায়? দেখা দিয়েই অদৃশ্য?' সিগারেটে জোরে টান দিয়ে সাহিত্যিক হঠাৎ সামনের দিকে ঝুঁকল। 'ওটা কার ফটো হে!'

'করবীর।' টেবিলে কুমারী করবীর বাঁধানো বড় ব্রোমাইড ছবিটার উপর দীপক চোখ রাখল। 'চিনতে পারছ না?'

'পারছি, এখন পেরেছি।' কমলেশ সোজা হয়ে বসল। 'কান ঘুরিয়ে বেণী দুটো তুলে দেওয়া হয়েছে। কি অদ্ভুত অন্যরকম লাগছে! মিশরের মেয়েদের মতন চোখ। গ্রীক মেয়ের চিবুক।' ছবির দিকে তাকিয়ে সাহিত্যিক অনেকটা নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠল।

ডাক্তারের একটু আগের গম্ভীর চেহারা আর নেই। চোখমুখ ঝলসে উঠেছে। করবীর চোখ ও চিবুকের বর্ণনা শেষ ক'রে কমলেশ দীপককে কিছু বলত কি?

করবী। পরদা নড়ে উঠল। দুই বন্ধু চমকে ঘাড় ফেরায়।

চা ও খাবারের প্লেট হাতে।

স্নান সেরেছে, প্রসাধন করেছে।

চা করেছে, তার উপর একরাশ খাবার।

'কখন এত করলেন, কি ক'রে পারলেন?' হেসে সোফা থেকে পা নামিয়ে কমলেশ সোজা হয়ে বসল।

দীপক সাহিত্যিকের মুখের দিকে তাকায়। তারপর করবীকে দেখে। করবী কথা না কয়ে সুন্দর স্মিত মুখ আনত রেখে চা ও খাবার টেবিলে সাজিয়ে দেয়।

ডাক্তার আর একটা নতুন সিগারেট বন্ধুর দিকে বাড়িয়ে দিলে।

'নাও, চা জুড়িয়ে যাবে। তুমি কি কোল্ড টি পছন্দ কর?'

দীপকের কথা কমলেশের কাণে গেল না। করবীর দিকে নিবিষ্ট চোখ।

'আমার কোন্ গল্প আপনার ভাল লেগেছে?' করবী মুখ তুলতে কমলেশ বলল।

'সব।' করবী একবার দীপককে দেখল, তারপর কমলেশের চোখে চোখ রাখল।

'গল্পগুলো কেমন?'

'নিষ্ঠুর।' স্বামীর দিকে না তাকিয়ে সাহিত্যিকের প্রশ্নের জবাব দিলে করবী। তারপর চোখ নামাল।

শব্দ ক'রে সাহিত্যিক হাসল।

'নিষ্ঠুর কে? আমি, না গল্প?'

করবী এবার জবাব দিলে না। দীপক মন্থর হাসল, 'তোমার চা জুড়োয়।'

চায়ে চুমুক দিয়ে কমলেশ ডাক্তারের দিকে ফিরল, ঘুরে বসল না যদিও।

'ডাক্তারের চেয়েও সাহিত্যিকের কাজ নিষ্ঠুর, বুঝলে ব্রাদার। ছুরি-ছুঁচের চেয়েও নিষ্ঠুরভাবে আমাকে কলম চালাতে হয়—কি বলেন আপনি? তাই নয় কি?'

কমলেশ আবার অপলক চোখে করবীকে দেখতে লাগল।

করবী মুহূর্তকাল দীপকের চেহারার উপর চোখ রেখে পরে কমলেশকে বলল, 'আপনার 'রেখা চন্দ' গল্প পড়ে আমি তিন রাত ঘুমোতে পারি নি।'

'সতর রাত জাগতে হয়েছিল গল্পটা লিখতে আমাকে।' কমলেশ করবীকে বলল, 'আপনি দাঁড়িয়ে কেন, বসুন!'

করবী বসল না।

কমলেশের পরিত্যক্ত প্লেটটা নুয়ে নিচে নামিয়ে রাখল। করবীর উজ্জ্বল দুধবরন ঘাড়ের উপর দোলানো বিস্ফারিত খোঁপা একটু-একটু কাঁপছিল।

'এত নিষ্ঠুর করতে গেলেন কেন রেখাকে?' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন করল ও।

'বলুন, এত রূপ ছিল কোন্ মেয়ের?' কমলেশ ঘাড় ফিরিয়ে মুখের ধোঁয়াটা অন্য দিকে ছড়িয়ে দিয়ে মন্থরভাবে হাসল। 'অত রূপ না থাকলে এতটা নিষ্ঠুর হতাম না যে আমি!'

করবী চোখের পাতা নামাল।

হাসির দমকে, কি কথার উত্তেজনায় সাহিত্যিকের নাসারন্ধ্র দুবার ঈষৎ স্ফুরিত হয়ে আবার স্বাভাবিক হয়ে গেল।

দীপকের সঙ্গে চোখাচোখি হতে করবী বলল, 'ক'টা বাজল? হসপিটালে তোমার ডিউটি আজ ক'টায়?'

চমকে উঠে ডাক্তার রিস্টওআচ দেখল।

'আটটা দশ। নটা পঁয়তাল্লিশে ডিউটি।' করবীর চোখে চোখ রেখে যেন মুহূর্তের মধ্যে দীপক আলস্যে নরম অবসাদে ম্রিয়মাণ হয়ে গেল।

'আজ আর ইচ্ছা করছে না যেন ডিউটিতে যেতে।'

'না-ই বা গেলে!' করবীর শরীর দুলে উঠল। চকিত উজ্জ্বল চাহনি। 'শরীর খারাপ ঠেকছে?'

'না, তা না।'

'না-ই বা আজ বেরোলে!' কমলেশ বন্ধুর মুখের দিকে তাকাল। 'আজ আমরা তিনজন বসে, এস, সাহিত্য-আলোচনা করি। কি বলেন?'

করবী বাঁকা হাসল দীপকের চোখে চোখ রেখে।

'সাহিত্যের আমি কিছু বুঝি না, ব্রাদার!' ডাক্তার নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল যেন। 'তোমরা গল্প কর, আমি শুনি।'

'বুঝবে, বুঝতে বুঝতেই বুঝবে। যার সঙ্গে আছ, না বুঝে উপায় কি!' খুব বেশী জোরে হাসল না সাহিত্যিক। করবীর সঙ্গে চোখাচোখি হতে করবী আবার চোখ নামাল। লক্ষ করল দীপক।

'বসুন আপনারা, আমি আসছি।' করবী বলল।

'খুব বেশীক্ষণ অদৃশ্য হয়ে থাকবেন না।'

'হিটারের সুইচটা না-হয় অফ ক'রে দিয়ে চলে এসো।' দীপক করবীকে বলল। দীপক গম্ভীর। করবী চমকে উঠল না। যেন 'তাই করব' ভঙ্গিতে ঘাড় নেড়ে পরদার আড়ালে অদৃশ্য হল।

'খুব বেশীক্ষণ অদৃশ্য হয়ে থাকবেন না।' বলছিল, যেন বলতে বলতে ছুটে যাচ্ছিল কমলেশ। দোলায়মান পরদার দিকে চোখ। করবী চলে যেতে ডাক্তারের দিকে হাত বাড়িয়ে বলল সে, 'কই দাও, সিগারেট দাও।'

দীপক নিঃশব্দে বন্ধুর হাতে সিগারেট তুলে দিলে।

কমলেশ সোফার উপর গা এলিয়ে দিয়ে সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করল।

'তোমার পাঁউরুটি নিচে পড়ে গেছে।' বলতে বলতে দীপক কমলেশের কোল থেকে খসে-পড়া রুটিটা টেবিলের উপর তুলে রাখল।

'বেশ সিম্পেথেটিক মহিষী।' সাহিত্যিক বলল, 'সত্যি কিনা?'

'কি ক'রে বুঝলে?' মুখে বলল না দীপক। সেই প্রশ্ন চোখে নিয়ে কমলেশের দিকে তাকাল।

'একটু শরীর খারাপ বোধ করতে তোমাকে বাড়িতে ধরে রাখেন।' সাহিত্যিক পরদার দিকে আর একবার তাকিয়ে পরে কমলেশের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে মৃদু হাসল। 'কথা বলছ না কেন?'

সিলিংএর দিকে চোখ রেখে ডাক্তার চুপ ক'রে ছিল। হেসে বলল, 'বোধ হয়, তোমার সঙ্গে বসে সাহিত্য-আলোচনা করবে বলে আমায় যেতে দিলে না।'

'না, শুধু তা কেন ? তাই বলে কি ?' অস্পষ্ট গুঞ্জনের মত কথাটা বলতে বলতে কমলেশের দুই চোখ হঠাৎ বড় বেশী উজ্জ্বল হয়ে উঠল। 'সাহিত্য বোঝে ভাল।'

'সারা দিন ঐ নিয়ে মেতে আছে।'

'তাই, তাই না !' কমলেশ জোরে সিগারেট টেনে পরদার দিকে চোখ রাখল। 'শি লুক্‌স্ লাইক্ ছাট্—প্রথম দৃষ্টিপাতেই আমি ধরে নিয়েছি।' বলে সে ডাক্তারের দিকে তাকাল। ডাক্তার কথা বলল না।

কবজি তুলে আবার ঘড়ি দেখল।

'তুমি কি তা'লে বেরোবেই ?' একটু অস্বস্তিবোধ করল সাহিত্যিক।

'না, তা না।' ডাক্তার কবজি নামিয়ে বন্ধুকে দেখল। মুখের গাম্ভীর্য সরিয়ে ঈষৎ হাসল। 'ভাবছি, যদি এখনই একটা জরুরী কল্ এসে যায়, না বেরিয়ে উপায় কি !'

কমলেশ আর বন্ধুর দিকে তাকাল না। বিড়বিড় ক'রে বলল, 'তা—হয়তো আসবে না।' বলতে বলতে চুপ ক'রে রইল।

'কি দেখছ ?' দীপক আশ্চর্য হল না। টেবিলে করবীর ছবির দিকে এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে সাহিত্যিক।

সাহিত্যিক হেসে ঘাড় ফেরাল।

'এটা ক'মাস ওর ?'

দীপক চমকে উঠল না। বন্ধুর চোখের দিকে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বলল, 'থার্ড মান্থ চলছে।'

'পৃথিবীর সাহিত্যে, বুঝলে দীপক', সাহিত্যিক সম্পূর্ণভাবে ঘুরে বসে ডাক্তারের দিকে, 'নারীর যত রূপবর্ণনা হয়েছে, এই স্টেজে সে সবচেয়ে বেশী সুন্দর হয়েছে।'

দীপক কথা কইল না।

কমলেশও চুপ।

সবগুলো জানলা দিয়ে ঘরে রোদ ঢুকেছিল।

সোনালী [illegible] মত রোদের এক-একটি রেখা করবীর মারাঠী বুকে, মিশরীয় চোখে, গ্রীক চিবুকে, ইরানী নাকে এসে বিঁধছিল।

দীপক সাহিত্যিক বন্ধুর বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে করবীকে দেখল। স্ত্রীকে নতুন ক'রে দেখতে পেয়ে ডাক্তার মনে মনে হাসল। 'তারপর, আর খবর কি তোমার ? কিছু লিখছ এখন ?' দীপক আবার একটা নতুন

সিগারেট ধরায়। এবার আর কমলেশ সিগারেট চাইল না। 'কি লিখছ?' দীপক দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করল।

'কিস্সু না।' সাহিত্যিক একটা নিশ্বাস ফেলল।

'কেন?' ডাক্তার সিগারেটের ধোঁয়া দিয়ে রিং করতে চেষ্টা করল।

'এ কি তোমাদের জরুরী কল্ যে, মুহুর্মুহু দরজায় এসে ঘা দেবে?' কমলেশ নাকে একটু শব্দ ক'রে হাসল। 'সেই রেখা চন্দর পর আর গল্প আসে নি মাথায়—তাও তিন মাস।'

'তিন মাস রুজিরোজগার বন্ধ?' ডাক্তার ভুরু কপালে তুলল। 'তারপর, তারপর তোমার চলছে কি ক'রে?'

'চলছে কি আর, ব্রাদার! চলার কথা ব'লো না। গল্প লেখা কি কঠিন! আর তাই লিখে পেট চালানো!'

কমলেশ দুই হাতে মুখ ঢাকল।

দীপক চুপ ক'রে সিগারেট টানতে লাগল। দীপকের সাহস হল না কমলেশকে জিজ্ঞেস করে, সাহিত্য ছেড়ে দিয়ে অন্য কিছু ধরবে কিনা, নাকি সাহিত্য করবে আর দুঃখ পাবে?

নাকি এই তার পণ, জীবনের মূলমন্ত্র? বড় বড় কবি, গল্পলেখক, ছবি-আঁকিয়ে, পিয়ানো-বাজানেওয়ালারা যে এইরকম এক-একটা আইডিয়া নিয়ে চলে, ডাক্তার জানত।

সে চুপ ক'রে রইল।

কমলেশ তার ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল। ডাক্তারের ফার্নিচার, আলমারির বই, ভাস্-এর ফুলঝাড়, কার্পেট ও পরদার প্রশংসা করতে লাগল। করবীর রুচি আছে—নিশ্চয় করবী এই ঘর সাজিয়েছে!

কমলেশ দীপকের পিঠে চাপড় মেরে বলতে লাগল। বলল, 'একটি মিসেসের মত মিসেস পেয়েছ বলে, দীপক, জীবনে প্রতিষ্ঠা পেলে। শহরে ডাক্তার তো কত আছে—ডাল-ভাত জোটে না এমন।'

প্রশংসা শুনে দীপক কোন মন্তব্য করল না।

পরদা কেঁপে উঠল।

করবীর ছায়া।

দীপক লক্ষ করল, করবী শুধু উনানের সুইচ অফ ক'রে আসে নি, নিজে মজুমভাবে সাজগোজ ক'রে এসেছে।

স্ত্রীর খোঁপার এই বিন্যাস দীপক জীবনে প্রথম দেখল, দেখল সেখানে প্রকাণ্ড একটা প্রজাপতি। আধুনিক প্ল্যাস্‌টিকের প্রজাপতির সাইজ কত বড় হয়, দীপক এ কথাটাই চিন্তা করছিল মনে মনে।

'আপনাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছি।' করবী কমলেশকে বলল।

'বা রে! তাতে কি!' সাহিত্যিক করবীর দিকে ব্যগ্র চোখে তাকাল। করবী চোখ নামাল। করবী প্রথমটায় কমলেশের যত সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল, দ্বিতীয়বার আর তত কাছে দাঁড়াল না। দাঁড়াল টেবিল ঘেঁসে ওর কুমারী-বয়সের ফটোর সমান্তরাল হয়ে।

যেন এইজন্যেই কমলেশ ঠোঁট টিপে হাসল।

দীপকের অনুমান মিথ্যা হল না।

'কিছু আর এখন লিখছেন না?' করবী প্রশ্ন করল।

'না, রেখা চন্দর পর আর গল্প লিখতে পারি নি।'

'কেন?' কৌতূহলে করবী ভুরু তুলল।

'আর রেখা চন্দ পাই নি।'

'আপনি কি সত্যিকারের মেয়ে নিয়ে গল্প লেখেন?'

'কি রকম?' করবীর এবারের প্রশ্নে কমলেশ প্রকাশ্যে হাসল এবং দীপকের সঙ্গে দৃষ্টিবিনিময় করল।

'হ্যাঁ, সত্যিকারের জীবনই তো বটে!'

বলে কমলেশ গম্ভীরভাবে জানলার বাইরে দীপকের পার্লারের সবচেয়ে বড় অর্কিডটা দেখতে লাগল। করবী সে দিকে তাকিয়ে। পাশের ঘরে টেলিফোন বাজতে দীপক ছুটে গেল।

'হ্যাঁ, আমি ডাক্তার ডি চক্রবর্তী।'

'গলায় একটা কাঁটা ফুটেছে, আপনি কি দয়া ক'রে—'

'না, আমার সময় নেই।' বিরক্ত হয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে দীপক শোবার ঘর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল।

'সত্যি, অনেক দিন পর গল্পের মত গল্প পেলাম একটা। কি অদ্ভুত! আপনি সাহিত্য বোঝেন।' সাহিত্যিকের গলা। 'আপনি লিখুন।' করবীর গলা। 'সত্যি, কত কাল আপনার গল্প পড়ি নি।' করবীর গলার স্বর শুনে ডাক্তার আরও দ্রুত পা চালিয়ে ড্রইং রুমে এল।

সাহিত্যিকের আঙুলের ফাঁকে সিগারেট জ্বলছিল। ধোঁয়ার একটা সূক্ষ্ম কুণ্ডলী কি ক'রে করবীর কাছে উড়ে গিয়ে ওর শরীর পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে

উপর দিকে উঠছিল। তারপর জানলা দিয়ে বেরিয়ে শরতের সোনার রৌদ্রে মিশে যাচ্ছিল।

'আমি যে গল্প আজ পেয়ে গেলাম আপনার কাছে, সেই গল্পে আমি রাজা হয়ে যাব। সত্যি বলছি আপনাকে, রেখা চন্দর গল্পের চেয়েও এই গল্প দামী হবে, নামী হবে। আঃ, কতকাল পর আবার আমার গল্পের খোরাক যোগালেন!'

দীপক করবীর চোখের দিকে তাকাল। করবী তৎক্ষণাৎ চোখ নামাল। দীপক কমলেশের চোখের দিকে তাকাতে, যেন কি একটা জয় করেছে সে, এমনভাবে ডাক্তারের চোখে চোখ রেখে হাসতে লাগল।

'বুঝলে ব্রাদার, আজ তোমার মিসেস এমন জিনিস দিলেন আমায়, যা লিখে আমি লক্ষ টাকা ঘরে আনতে পারব।'

কি সেই গল্প, কার জীবনের এ কাহিনী, কে এই সত্যিকারের মেয়েটি— দীপক ভাবল। এত তাড়াতাড়ি একটা জীবনের মালমশলা করবী কি ক'রে কমলেশকে দিতে পারল, ডাক্তার তাও ভাবল। শোবার ঘরে গিয়ে টেলিফোন ধরতে ও ছেড়ে দিতে ক' মিনিট সে ব্যয় করেছে?

'চললে?' অবাক হল না দীপক।

'হ্যাঁ, আমারও জরুরী কল্ এসে গেছে। এক্ষুনি গিয়ে গল্পটা লিখে ফেলব।' সাহিত্যিক উঠে দাঁড়ায়। 'চলি।' দু হাত জোড় ক'রে সে করবীর দিকে তাকাল।

'গল্পটা লিখে আমায় পড়াবেন।'

'নিশ্চয়!'

কমলেশের উজ্জ্বল চোখে কি পাওয়ার আনন্দ, করবীর চোখে কি যেন দিতে পারার উজ্জ্বলতা। নববর্ষার নীল অপরাজিতার মত সুন্দর চোখ মেলে কমলেশকে এগিয়ে দিতে ও দরজা পর্যন্ত গেল।

আবার টেলিফোন।

কিন্তু ডাক্তার উঠল না। দু হাতে মুখ ঢেকে চুপচাপ বসে।

'আমি যাব? আমি গিয়ে ধরব?' করবী খোঁপার প্রজাপতিটা খুলতে খুলতে বলল, 'কি ভাবছ?'

'কার গল্প বললে? কে সেই মেয়ে?' মুখ থেকে হাত সরিয়ে দীপক প্রশ্ন করল, 'আমায় বলবে না?'

'আশ্চর্য!' টেলিফোন বাজছে শুনে করবী যেন ঈষৎ রুষ্ট। 'আমি যাব? আমি গিয়ে ধরব?'

দীপক ঘাড় নাড়ল।

করবী ও ঘরে গেল এবং এক মিনিটের মধ্যে ফিরে এল। 'কেউ তোমায় একটু আগে ডেকেছিল?' দীপকের চোখের দিকে তাকায় করবী।

দীপক মাথা নাড়ল।

'গলায় মাছের কাঁটা আটকেছিল। এইমাত্র ভদ্রলোক মারা গেলেন, তাঁর কে এক আত্মীয় টেলিফোনে জানাচ্ছিল তোমায়।' বলল, বলা শেষ ক'রে করবী খোঁপার প্রজাপতিটা হাতে নিয়ে গভীর মনোযোগ দিয়ে সেটা দেখতে লাগল।

'তুমি কি আমায় বলবে না?'

'কি বলব?' করবী চোখ তুলল। দীপক উঠে এসেছে পাশে।

'কমলেশকে কি দিলে? কি এমন লক্ষ টাকার মালমশলা তোমার কাছ থেকে ও পেয়ে গেল—'

দীপকের গলার স্বর শুনে চমকে উঠল না করবী, শুধু চোখ নামাল।

'আশ্চর্য!' অস্ফুটে বলল ও একবার।

'কি আশ্চর্য? বল—বল।' ভয়ংকর অস্থিরভাবে ডাক্তার স্ত্রীর হাত চেপে ধরল।

হাত ছাড়িয়ে নিলে করবী। জানলার কাছে সরে যেতে যেতে বলল, 'কি নিষ্ঠুর তুমি! একটা লোক গলায় কাঁটা ফুটে মরে গেল, ভাবছি আমি সে কথা, তুমি ভাবছ গল্প!' বলতে বলতে করবী পাথরকুচির মত সুন্দর শাদা দাঁত বার ক'রে অদ্ভুতভাবে হাসল। 'বললে কি তুমি বুঝবে? সাহিত্যের তুমি কিছু বোঝ না যে!'

দীপক ফ্যালফ্যাল চোখে যখন করবীর হাসি দেখছিল, কমলেশ তার ঘরে বসে হুড়হুড় ক'রে একটা গল্প লিখে চলছিল। আর, লেখার ফাঁকে ফাঁকে জানলার বাইরে রৌদ্র-উজ্জ্বল নীল সোনালী আকাশের দিকে এক-একবার তাকিয়ে হাসছিল।

কমরেড

অনেক হাঁটাহাঁটির-খোঁজাখুঁজির পর সম্প্রতি এক পার্ক আবিষ্কার করেছি। ছোট—তা হ'ক, চমৎকার নির্জন। আছে প্রচুর গাছ, প্রশস্ত ছায়া, গালিচার মতন নরম মসৃণ ঘাস। বড় রাস্তা বেশ খানিকটা দূরে। কতক্ষণ কান পেতে থাকলে তবে যদি শোনা যায় ট্রাম-বাসের শব্দ। আরও মজা—সন্ধ্যা হতে চাই কি এখানে ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকে, একটু জোরে বাতাস বইলে গাছের পাতায় সয়্‌সয়্‌ শব্দ হয়। পার্কটা ভালো। ভালো লাগার আরও একটা কারণ —লাল সুরকি-ঢালা সরু রাস্তা ধরে সবটা ঘুরে আসতে বার মিনিট সময় নেয়, বড় জোর তের। সুতরাং একবার প্রদক্ষিণ শেষ ক'রে উৎসাহের বশবর্তী হয়ে আমি দ্বিতীয় বারের জন্য প্রস্তুত হই। ক্লান্তি আসে না। দীর্ঘ পথ বা দিগন্তবিস্তারী মাঠের মোহ আজ নেই, দুঃসাহসিকতার বয়স অতিক্রান্ত।

আমার বিশ্রামের জায়গা দক্ষিণের বাদাম গাছটার তলায়। ঘুরে এসে এক-একদিন অবাক হয়ে যাই। স্ফীতকায় ক্ষিপ্ত অশ্বের এ কি দুরন্ত আস্ফালন! লাফিয়ে আকাশ ডিঙোতে চাইছে। পায়ের উৎক্ষেপণে, গতির গমকে শরীরের পেশীগুলো টগ্‌বগ্‌ করছে। পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যাস্তের লাল আভা তির্যক বর্শাফলকের মতন হঠাৎ বুকে বিঁধতে ও কি এমন স্তব্ধ হয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে ভুল ভাঙে। ওটা ব্রোন্‌জ। ছাঁচে ঢালাই হয়ে অভিশপ্ত চিরদিনের জন্যে জমাট বেঁধে আছে। ভাবি, দুরন্ত সজীবকে ব্যঙ্গ করবার জন্যই কি মানুষের এই ধাতব রসরচনা, ধূর্ত কারিগরি!

'প্রতাপের ঘোড়া আরও বড় ছিল?'

চমকে উঠি। পাখির গলার মত মিষ্টি, ঝিঁঝির ডাকের মত ঠাণ্ডা শোনাল না কথাগুলো?

বললাম, 'আরও বড় ছিল, আরও জোয়ান।' ঘুরে দাঁড়িয়ে বেন্‌চের হাতলের উপর একটা হাত রাখলাম। কালো শু, শাদা স্টকিং পরা ফুট্‌ফুটে পা। হাঁটু অবধি সাদা সাটিনের ফ্রক। আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, 'প্রতাপের ঘোড়ার নাম জান?'

বললাম, 'চৈতক।'

'নীল রং ছিল ?'

'না, সাদা।'

ঘাড় ফিরিয়ে ও আবার দেখতে লাগল কংক্রিটের স্তম্ভের উপর সেই ধাবমান স্তব্ধ ঘোড়া। আর, আমি দেখি ওকে। রৌদ্রের শেষ রক্তরেখা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়। ওর মাথার কালো কোঁকড়া চুল আজও বেণীর শিকলে বাঁধা রয়েছিল। বনের ঝুম্‌কো-ঝোপের মত এলোমেলো বাতাসে দোলে। হঠাৎ প্রশ্ন ক'রে বসল, 'শিবাজির ঘোড়া কে ছিল, বল তো ?'

হেসে বললাম, 'ধুন্দুল ?' নামটা সঠিক মনে ছিল না।

'তুমি সব জান।' একটু অবাক হ'য়ে গেছে ও।

'জানব না ?' বেন্‌চের এক ধারে এবার টুপ্‌ ক'রে বসে পড়লাম। হাতের লাঠি এক দিকে ঠেকিয়ে রেখে আরম্ভ করি শিবাজির কাহিনী। 'কঙ্কন দেশের অরণ্য-উপত্যকা পার হয়ে খরস্রোতা নীরা নদীর তীর ধরে মারাঠা বীর যান সিংহগড় দুর্গ জয়ে, সঙ্গে আছে দু শ' মাওলি সৈন্য। ইয়া জোয়ান সব মরদ, এত বড় বুকের পাটা।'

'তারপর ?' তন্ময় হয়ে ও গল্প শুনছিল।

মাথায় দুষ্টামি বুদ্ধি এল। বললাম, 'তোমার নামটি আগে বল, মা।'

হায়, কোথায় গেল সেই তন্ময়তা, কালো চোখের বিস্ময়! বুঝলাম, ভুল করেছি কোথাও। অভিমানে ঠোঁট গেছে ফুলে, ভুরু উঠেছে বেঁকে।

'আমি বুঝি বুড়ি, আমি তোমার মা ?'

হেসে বললাম, 'বুড়ি হবে কোন দুঃখে, তুমি যে খুকুমণি!'

না, এবারও প্রসন্ন হল না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। জুতোটা মাটিতে ঘসতে ঘসতে এগিয়ে গেল খানিকটা। একটা ঘাসের ডগা তুলে নখ দিয়ে কুটিকুটি ক'রে ছিঁড়ে ফেললে। ফিরে এসে যখন সামনে দাঁড়াল, দু চোখে দুষ্টুমির হাসি। বললে, 'আমি মাও নই, খুকুমণিও নই।'

'নিশ্চয়ই না! কি বলে ডাকব, বল।'

'আমি কমরেড।' কথার শেষে মাথা দুলিয়ে ও খিল্‌খিল ক'রে হেসে উঠল। আমি স্তব্ধ। মনে মনে প্রণাম জানালেম যুদ্ধোত্তর বিংশ শতাব্দীকে। পাকা ঝুনো মাথায় যা আসে নি, এক ফোঁটা মানুষ তা অক্লেশে সমাধান ক'রে দিলে। বেজায় খুশী হয়ে বললাম, 'আমরা কমরেড, কেমন!' দশ আর তিপ্পান্ন বছরের মাঝখানে বন্ধুত্বের সাঁকো গড়া হল। ফিরে এসে ও পাশে বসেছে। শিবাজি-কাহিনীর বাকি অংশ আমার শেষ করতে

হয়। তখন প্রায় অন্ধকার। ব্রোন্জের ঘোড়া গেছে ঝাপসা হয়ে। ও উঠে দাঁড়াল।

'আমি এখন বাড়ি যাব।'

'কোনটা তোমাদের বাড়ি?'

আঙুল দিয়ে পার্কের পশ্চিম দিকে ও একটা বাড়ি দেখিয়ে দেয়। গেট পার হবার সময় ছোট্ট হাত তুলে কমরেড বললে, 'গুড নাইট!'

'নাইট!' আর ওকে দেখা গেল না।

পরদিন। সাদা সাটিনের বদলে কালো রঙের ফ্রক। ব্রাউন ক্রোমের জুতো। চুল তেমনি এলোমেলো। ঝুমকো-ঝোপ। কিন্তু আমার উপর এমন বিরূপ হয়ে আছে, কে জানে! পার্কে পা দিয়েছি, কি চোখ ঘুরিয়ে কমরেড বললে, 'তুমি মোটে পাংচুয়্যাল নও!'

'আফিস-ফেরতা,' হাত ধরে, যেন মস্ত অপরাধী আমি, বললাম, 'দেরি হয়ে গেছে।'

বন্ধু সে কথা শুনবে কেন! দস্তুরমতো মিলিটারি মেজাজ। 'ঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে খেতে হয়, বেড়াতে হয়, কাজ করতে হয়—এটা শেখ নি?'

'এখন শিখলুম।' প্রাণপণে হাসি সংবরণ করি। 'কাল থেকে টাইমের এক তিল নড়চড় হবে না। চল, ওখানে গিয়ে বসি।' আজ আর শিবাজির কাহিনী নয়, মনে ছিল শর্মিষ্ঠার গল্প। কিন্তু মনে থাকলে হবে কি! তখনই বেন্‌চে বসে পড়বার প্রস্তাব ওর মনঃপূত হল না।

'আগে আমরা বেড়াব।'

তথাস্তু।

'তুমি রোজ ক'বার চক্কর দাও?'

'এই দেড়বার-দুবার। তুমি?'

কথার উত্তর দেবার আগে কমরেড হাসল।

'তুমি একটা কুঁড়ে। আমি চারবার ঘুরে এসে তবে বসি।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলি। পক্ককেশ, স্খলিতদন্ত বৃদ্ধকে দেখে তোমার করুণা নেই। একটা অপবাদ তো দিলে!

'ও কি, দাঁড়িয়ে পড়লে কেন?'

বললাম, 'চল।'

দু পা হেঁটে কমরেড উঁহুঁ করল।

'হয় না, কিচ্ছু হচ্ছে না ! তুমি হাঁটতে শেখ নি।'

'এই তো দিব্যি হাঁটছি!'

'ছাই হচ্ছে!' ভ্রূযুগল কুঞ্চিত ক'রে ও মুখ ঘোরালে। 'পা মিলিয়ে চলতে হবে না ? আমায় দেখে পা ফেল।'

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট,

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।

চললুম আমরা পাশাপাশি হয়ে।

চাঁপা গাছের কচি পাতায় তখন বাদামী রোদ লেগেছে।

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট। ভাবি, ছেলেমানুষী মরজির অন্ত নেই। হেসে বললাম, 'আমায় পল্টন বানিয়ে ছাড়বে ? যুদ্ধে যাব ?'

'যাবে যুদ্ধে ?' কমরেড ঝলক দিয়ে উঠল। তারপর কি ভেবে ছোট্ট মাথাটি নেড়ে বিজ্ঞের মত ও বলল, 'বুট পরে, এত বড় বন্দুক কাঁধে নিয়ে, নদী-নালা-পাহাড়-জঙ্গল ডিঙ্গিয়ে তুমি হাঁটতে পারবে না--মরে যাবে।'

'কেন পারব না, খুব পারব!' সোৎসাহে মাথা নেড়ে লাঠিটা মুঠোর মধ্যে শক্ত ক'রে ধরলাম, 'এই এমনি ক'রে চলে যাব।'

ঈশ্বর জানে, উপেক্ষায় কি করুণায় কমরেড আকাশের দিকে মুখ ক'রে আস্তে আস্তে বললে, 'তুমি ছুটতেই পারবে না!'

'তুমি পারবে ?'

'নিশ্চয়—এই দেখ!' বলে কি এক উত্তেজনায় দেখ্‌-না-দেখ্‌ ও কিনা বোঁ ক'রে এক দিকে ছুটে গেল। ভাবলাম, আচ্ছা বন্ধুর পাল্লায় পড়েছি! সবটা পার্ক চক্কর দিয়ে ও এসে সামনে দাঁড়াল।

'দেখলে ? আমি ঠিক যুদ্ধে যাব।'

কপালে ঘামের ফোঁটা। দ্রুত নিশ্বাসপতনে গলার নীল শিরা ধুক্‌ধুক্‌ ক'রে কাঁপছে। ছোট্ট মুখ আপেলের মত টুকটুকে। চুড়ির ঝঙ্কারের মত কথাগুলো কানের কাছে বেজে উঠল : 'যুদ্ধে যাব।' যুদ্ধে না গিয়ে তোমার উপায় আছে বাঙালীতনয়া ? পাঁচটি অপোগণ্ডের মুখে দুধ যুগিয়ে, স্বামীর আফিসের রান্না নামিয়ে, ননদ-জার সঙ্গে ঝগড়া করতে কত কুরুক্ষেত্র জীবনের উপর দিয়ে যাবে-আসবে! আর, মহাযুদ্ধের পর্ব ঠেলে না আজ আমি তিপ্পান্ন বছরের প্রান্তে এসে ঠেকেছি! খাতা—কলম—লেজার—বড়বাবু—জরিমানা—বাত—পিত্ত—কফ। সংগ্রামের শেষ কোথায় ?

কমরেড হুঙ্কার ছাড়ল, 'চল, আর দাঁড়ায় না।'

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট।

পর-পর দুবার চক্কর দিয়ে হাঁফাতে আরম্ভ করি। অত ছোটা যায়! বললাম, 'এবার একটু বসা যাক।'

'উহুঁ, এখানে নয়, লেকের ধারে।'

পার্কের গা ঘেঁসে কৃত্রিম হ্রদ এতকাল লুকিয়ে ছিল, আমার চোখে পড়ে নি। সোনালী আলোয় টলমলে জল। বন্ধু আমায় টেনে নিয়ে গেল জলের ধারে। আবার কি নতুন খেয়াল, কে জানে! লম্বা সবুজ ঘাসের ভিতর ওর হাঁটু পর্যন্ত ঢেকে গেছে। আমার কানে কানে বললে, 'চুপ, কথা ক'য়ো না।'

একটা কিছু রহস্যের আশায় চুপ ক'রে থাকি।

জলে আঙুল ডুবিয়ে কি একটা সাংকেতিক শব্দ ক'রে ও হাতটা তুলে আনল। তীর ঘেঁসে প্রকাণ্ড দুই লাল মাছ ভেসে ওঠে। গায়ে লম্বা সোনালী ডোরা-কাটা। মাছেরা নিঃশব্দে কতক্ষণ ইদিক-ওদিক ঘোরাফেরা ক'রে ফের তলিয়ে গেল।

রুদ্ধশ্বাসে ও এতক্ষণ জলের উপর ঝুঁকে ছিল। মাছ চলে যেতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে হাসলে। 'দেখলে, ওরা আমার ইশারা বোঝে, আমার ডাক শোনে!'

'তাই নাকি!' বেজায় অবাক হয়ে যাই।

'ওরা আমার বন্ধু।'

'পৃথিবীর সবাই তোমার বন্ধু।'

কমরেড কথার উত্তর দিলে না। জলে হাত ডুবিয়ে ও আবার মাছেদের ডাকতে ব্যস্ত। স্তব্ধ অন্ধকার ঠেলে এবারও মাছ দুটো ছুটে এল, আর তন্ময় হয়ে আমার বন্ধু রইল জলের উপর নুয়ে। একটা হল্‌দে প্রজাপতি ওর মাথার উপর দিয়ে নেচে নেচে এক দিকে উড়ে যায়। লেকের জল, তীরের গাছপালা ঝাপসা ক'রে অন্ধকার নামল। রুপোলী ফুটকির মত বুদ্‌বুদ্‌ তুলে কখন মাছেরা অদৃশ্য হয়েছে।

আমরা উপরে উঠে এলাম।

ভারি বিষণ্ণ গলায় একসময়ে কমরেড বললে, 'ওদের খিদে পেয়েছিল।'

'তাই নাকি?'

পাকা গৃহিণীর মত ভুরু টান ক'রে কমরেড বললে, 'নইলে আর এমন হাঁ ক'রে বারবার আমার কাছে ঘেঁসছিল!'

'কাল দু টিন বিস্কিট নিয়ে আসব। ঠিক।'

বেলা পাঁচটা বাজতে আজকাল এমন অস্থির হয়ে পড়ি! কেবল ঘড়ির কাঁটায় চোখ থাকে। পার্ক আমায় ডাকে। অফিসের ভারি দেওয়াল, কাগজ-পত্রের স্তূপ ভেদ ক'রে আমার সামনে ভেসে উঠেছে কালো পালক-ঘেরা দুটি চঞ্চল চোখের দীপ্তি। গাছের ছায়ারা এখন লম্বা হয়ে এসেছে। ছায়ার ফাঁকে ফাঁকে ঝরে পড়ছে বাদামী রোদের চুম্‌কি। এই বেলা আমাদের রুট্‌ মার্চ আরম্ভ হবে। আরম্ভ হবে ওর শাসন-ধমক, আবদার-অভিমান। পায়ে পায়ে বন্ধুর মন রেখে না চলেছ তো বিপদ! এক-টুক্‌রো মানুষটির কথামত আমায় ছুটতে হয়, বসতে হয়, বিস্কিটের গুঁড়ো ছড়িয়ে মাছেদের খাওয়াতে হয়। ও আমায় সম্পূর্ণ করায়ত্ত ক'রে ফেলেছে। আমি বদলে গেছি। যেন আবার সেই ছেলেবেলাকার দিনগুলো ফিরে এসেছে। আমরা ছেলেমানুষ। তা ছাড়া কি!

এক ছড়া পাকা লিচু বন্ধুকে উপহার দিয়েছি। খোসা ছাড়িয়ে টপাটপ দুটো মুখে পুরে কমরেড হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে, 'ও আর খেয়ে কাজ নেই।' হায়, এমন সুপক্ক রসালো ফল তোমার মুখে রুচল না! মন আফসোসে ভরে ওঠে।

গম্ভীর হয়ে বন্ধু বললে, 'আমরা আজ বন্দুক ছুঁড়ব।'

আঁতকে উঠি। তবেই সেরেছে! এবার গুলি ঠিক বুকে লাগবে। বললাম, 'বন্দুক কোথায় পাবে?'

কমরেড মিটিমিটি হাসে।

'দাঁড়াও তুমি এখানে।' বলে ও খানিকটা দূরে সরে গিয়ে হাঁটু ভেঙ্গে মাটির উপর বসে কচি বাহুর দুর্জয় ভঙ্গি ক'রে আমায় 'তাক্‌' করলে। এক চোখ বুজে মুখে 'ঠুস্‌' শব্দ ক'রে বন্দুক ছুঁড়তে আমার কপালে এসে ঠেকল এত বড় একটা লিচু।

'দেখলে, কেমন নিশানা করি!'

'চমৎকার!'

বুক ফুলিয়ে, গলা উঁচিয়ে, জুতোর মস্‌মস্‌ শব্দ তুলে এক হাইল্যাণ্ডার্স এসে সামনে দাঁড়াল যে! চোখে-মুখে সাফল্যের ক্রূর দীপ্তি। বললে, 'এবার তোমার পালা।' চ্যালেন্‌জ্‌ ছুঁড়ে কমরেড দূরে স'রে দাঁড়ায়।

পরীক্ষা কঠিন। দুরুদুরু বক্ষে ডান হাতের বুদ্ধা নেড়ে ট্রিগার চেপে ধরি। নিশানা ব্যর্থ হয়। লিচুটা গড়িয়ে গিয়ে পড়ল বাদাম গাছের গুঁড়ির কাছে। কমরেড হুঙ্কার ছাড়ল, 'হয় নি, হল না। তুমি কোনও কাজের নয়।'

ব্যর্থতার গ্লানিতে আমার মুখ কালো।

'তাতে কি, আবার চেষ্টা কর! এবার হবে।' যেন বরাভয় শুনছি। কমরেড ছুটে আবার তার নির্দিষ্ট জায়গায় দাঁড়াল। আমি তাক্ করলাম। এবার গুলি লাগল ওর হাতে। আর দেখ-না-দেখ ও ঘাসের উপর সটান শুয়ে পড়েছে। মানে —আহত। হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। এত বুদ্ধি পেটে! টেনে তুলে জামার ধুলো ঝেড়ে দিই। এমনি সব খেলা আমাদের।

একদিন খেলা ভাঙল। রাজ্যের মেঘ এসে জড়ো হয় মাথার উপর। বৃষ্টি—বৃষ্টি। শহরের পথঘাট, বাড়িঘর সব ধোঁয়াটে ঝাপসা হয়ে আছে। বাইরে পা বাড়ানো অসম্ভব। বাসের কোণায় কোনমতে বাদুড়-ঝোলা হয়ে অফিসে যাই। অফিস থেকে বাড়ি। পার্ক? এ দিনে পার্কের নাম শুনলে লোকে পাগল ঠাওরাবে। অগত্যা সন্ধ্যা কাটে ঘরে বসে। ছটফট্ করি। বারবার জানলার বাইরে তাকাই। মনে হয়, কত কাল পার্কে যাই নি। এক দিন—দু দিন। তিন দিনের দিন বৃষ্টি ধরল তো আকাশের থমথমে ভাব কাটল না। যা হ'ক্, দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম। আহা, পার্কের সে কি চেহারা! জলে ভিজে ভিজে গাছগুলোর আজ জ্বর হয়েছে যেন। স্তব্ধ গুমোট ভাব। গালিচার মত নরম সবুজ ঘাসের সে শ্রী গেল কোথায়! এখানে জল, ওখানে কাদা। বাদাম গাছের তলায় আমাদের বেন্চটা শূন্য। হাতলের উপর একটা কাক বসে ডানার জল ঝাড়ছে। আর অদূরে দাঁড়িয়ে আছে সেই কালো ব্রোন্জের ঘোড়া। চিরকাল ওটা ওখানে একভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে। পশ্চিমের গেট পার হয়ে আমি রাস্তায় নেমে যাই।

এ পাশে লাল রং-করা ডাকবাক্স। ওধারে সাদা বিশাল ফটক। এক পা এক পা ক'রে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে যাই। সাহস হয় না। সিঁড়ি থেকে ছাদের কানিস পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে দমে গেলাম। অত বড় বাড়ির কোন্ মহলের কোন্ কোণায় ও লুকিয়ে আছে, কে জানে। হয়তো লাল মাছের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে সাদা পুসিকে কোলে টেনে নিয়ে এখন দুধ খাওয়াতে ব্যস্ত। ফিরে যাব? ভাবতে ভাবতে দো-মনা হয়ে আরও এক পা অগ্রসর হই। দৈত্যের মত সামনে লাফিয়ে পড়ল ভীষণদর্শন স্প্যানিয়েল। সাদা দাঁত দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে আমার শুকনো মাংস

ছিঁড়ে খাবে নাকি ! ভাগ্যিস হাতে লাঠি ছিল ! কিন্তু লাঠি বাগিয়ে ধরবার আগেই যে মন্ত্রশান্ত ভুজঙ্গের মতন কুকুর আমার পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে। তাই বল, পাশে দাঁড়িয়ে কমরেড !

'পার্কে বেড়াতে এসেছিলে ?'

'না, তোমায় দেখতে।'

'ভিতরে এস।'

দ্বিধায় ও সংকোচে দুলতে থাকি। বন্ধুকে চিনি, কিন্তু বাড়ির সঙ্গে তো পরিচয় নেই ! চালাক মেয়ে, বললে, 'তোমায় কেউ কিছু বলবে না, বাড়িতে কেউ নেই।'

আরও ঘাবড়ে গেলাম।

'কেউ নেই ?'

'কাকাবাবু-কাকিমা বেড়াতে গেছেন।'

'আর, এখানে তুমি একলা—'

'দূর ছাই, কিছু বোঝ না !' আমার হাতে ধরে দুর্দান্ত ঝাঁকুনি। 'আমি যে বাবার কাছে ছিলাম ! চল, বাবাকে দেখবে।'

বুঝলাম, কাকাবাবু-কাকিমা কড়া মানুষ, বাবা উদার। বললাম, 'চল।'

বারান্দা পার হয়ে হলঘর। আবার বারান্দা। চারদিকে ছড়ানো সৌখিন আসবাব, চমৎকার সাজানো-গোছানো বাড়ি। বন্ধু চলেছে আগে, আমি পিছনে।

'পা মিলিয়ে চল কিন্তু !'

হেসে বললাম, 'হ্যাঁ, ঠিক আছে।'

লেফ্‌ট রাইট লেফ্‌ট। পুরু কার্পেটের উপর ওর জুতোর থপ্‌থপ্‌ শব্দ হয়, চুল উঠল কেঁপে। দোতলার সিঁড়ির মুখে এসে পাশের টাব্‌ থেকে ও প্রকাণ্ড দুটো ক্রিসেন্‌থিমাম্‌ ছিঁড়ে নেয়।

'এটা তুমি বাবাকে দিও—আমি দেব একটা।'

'বেশ, তাই হবে।' ফুল হাতে নিয়ে মনে মনে হাসি।

দোতলার নিভৃততম প্রান্তের সবচেয়ে ছোট ঘরে আমরা এসে গেছি।

'এটা আমার পড়ার ঘর।'

'তাই নাকি ?' বললাম, 'চমৎকার !'

ছোট টেবিল, ছোট আয়না, ছোট শেল্‌ফ।

'এস, বাবাকে দেখবে।'

'চল।' তাড়াতাড়ি কোটের বোতাম, গলার মাফ্‌লার টেনে-টুনে ঠিক ক'রে নিই। আমায় হাতে ধরে ও টেনে নিয়ে গেল আর একটা টেবিলের সামনে। রুপোর ফ্রেমে আঁটা বড় একটা ব্রোমাইড ছবি দাঁড় করানো। স্তব্ধ হয়ে গেলাম।

'তোমার বাবা বুঝি?'

'যুদ্ধে মারা যান।' হেসে মাথা নেড়ে কমরেড বললে, 'বাবার চোখে বুলেট লেগেছিল।'

রিপোর্ট

আমি কাগজের রিপোর্টার, সেইজন্যই আমার পাড়ায় এই মহাখবর।

রবিবারের বাজার, তাই হট্টগোলটা বেশী হল, কোলাহল কানে এসে লাগল জোরে, একসঙ্গে অনেক লোক হাহাকার করছিল।

রুদ্ধশ্বাসে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। জামা-জুতো পরা, কি রিপোর্ট টুকতে কাগজ-পেন্সিলের দরকার, তার পর্যন্ত ভাববার সময় ছিল না।

রাস্তায়, রকে, দোতলার বারান্দায়, এমন কি কোনও কোনও বাড়ির ছাদের উপর লোক দাঁড়িয়ে গেছে, দেখতে পেলাম।

ছুটির দুপুর। খেয়েদেয়ে অনেকেই হয়তো বিছানায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল।

তাই আমার মতন অনেকেরই গায়েই জামা ছিল না, কি শুধু গেঞ্জি, খালি পা বা সাধারণ চটি। খবর শুনতে লাফিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়েছে। লক্ষ করলাম, রাস্তার উত্তর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে আছে সবাই।

অর্থাৎ সেদিকেই বার নম্বরের বাড়ি।

'কি নাম ভদ্রলোকের?'

'ক্ষিতীশ রুদ্র।'

'এই পাড়ার ছেলে?'

'হ্যাঁ, মশাই—হ্যাঁ। চোখের উপর তো দেখলেন, তিনটে পুলিসের গাড়ি পাড়ায় ঢুকল, পঁচিশ মিনিটের মধ্যে।'

রুদ্ধ নিশ্বাস একবার পরিত্যাগ করলাম।

ঢোঁক গিলে আমি আরও কয়েক পা অগ্রসর হলাম।

'ওদিকে বেশী দূর যাবেন না, মশাই।' একজন, ফিসফিসে গলায় যদিও, আমায় সাবধান ক'রে দিয়ে বলল, 'খুনের কেস।'

অপরাধের মধ্যে, ক্ষিতীশ রুদ্রের পেশা কি ছিল প্রশ্ন করতে এক ভদ্রলোক আমায় তেড়ে মারতে এলেন। 'আপনি দেখছি, মশাই, ভয়ানক রসিক লোক! এ পাড়ায় আছেন, ক্ষিতীশকে চেনেন না?'

'ক্ষিতীশকে চেনেন না?' আর একজন গলা আরও চড়িয়ে দিলে। 'ডি

আর সন্‌ কোম্পানিতে চাকরি করত; তিন শ' তেষট্টি দিন তো এই রাস্তা দিয়ে এককালে ও অফিসে গেছে, মশাই—আপনার দরজার সামনে দিয়ে বাজার নিয়ে বাড়ি ফিরত। এরই মধ্যে সেই চেহারা ভুলতে আরম্ভ করলেন? আচ্ছা লোক যা হ'ক!'

হঠাৎ একটা ঘর পেয়ে আমি পাড়ার নতুন বাসিন্দা হয়েছি, কথাটা বলতে সাহস পেলাম না। চুপ ক'রে রইলাম।

তাড়া খেলেও ক্ষিতীশ সম্পর্কে আমাকে বিস্তারিত সব খবর জানতে হবে। তাই আরও একটু অগ্রসর হলাম।

একজন বলল, 'ঐ লাইট পোস্ট লাগোয়া লাল রকটায় লুঙ্গি-পরা নিমের ডাল চিবোচ্ছে রোজ সকালবেলা বসে থাকতে তাকে কে না দেখেছে!'

'কি করত এত সকালে ও ওখানে?'

'খবরের কাগজে টেস্ট ক্রিকেটের রেজাল্ট দেখতে বসে থাকত।'

'খেলাধুলোর খুব শখ ছিল বুঝি?' একজন মন্তব্য করল। 'থাকবেই তো! কত আর বয়স হয়েছিল! জোয়ান ছেলে।'

সামনের খোলা বারান্দায় জটলাটা আরও বড় রকমের দেখে আমি সেদিকে অগ্রসর হলাম।

'আহা, ওই তো ওখানে রোজ বিকেলে মেয়েটা দাঁড়িয়ে থাকত! বাবা অফিস থেকে ফিরবে। একটা কিছু হাতে নিয়ে আসবে।'

অফিস-ফেরতা ক্ষিতীশ মেয়েকে কি এনে দিত জানার প্রবল ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও আমি কাউকে প্রশ্ন করতে সাহস পেলাম না।

একজন বলল, 'হাতে যদ্দিন রেস্ত ছিল, স্ত্রী-কন্যাকে সাধ্যমতন সুখে রাখতেই চেষ্টা করেছিল।'

'ওই একটি তো মেয়ে ছিল?' কে একজন প্রশ্ন করল, 'ক'দিন চাকরি ছিল না ক্ষিতীশের?'

'মাস চার-পাঁচ—হ্যাঁ, ছ মাসই হবে।'

'আঃ!' কার দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল। 'তা একটা মেয়ে, আর বৌ, আর ও নিজে। আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব কেউ কি ছিল না? ও না থাক, না খেত, বৌটা-মেয়েটাকেও অন্তত কিছুদিনের জন্যে পাঠিয়ে—'

কেউ শব্দ করল না।

'আছে এক-একটা এমন জেদী মানুষ সংসারে।' কতক্ষণ পর পিছন থেকে কে মন্তব্য করল। 'মহাদুর্দিনেও পরাশ্রয়ের প্রত্যাশা রাখে না।'

'হয়তো বন্ধুবান্ধব-আত্মীয়স্বজনের কাছে গিয়ে সাহায্য চেয়েছিল। একবার পেয়েছে। দ্বিতীয়বার যখন হাত পাততে গেছে, কেউ দেয় নি। ছ মাস রুজিরোজগার বন্ধ হয়ে থাকা কি চারটিখানি কথা!'

'আর এ দিনে কেই বা কাকে সাহায্য করতে পারে!' একজন বলল, 'এদিকে তো ও আমাদের সঙ্গে মেলামেশা একেবারে ছেড়ে দিয়েছিল!'

'কি ক'রে রাখত মেলামেশা!' পিছন থেকে বেশ বাঁকা সুরে কে শুনিয়ে দিলে, 'এমন বেকায়দায় পড়লে সকলেরই অই অবস্থা হয়। কোথায় থাকে তখন বন্ধুবান্ধব, ফুটবলের রেজাল্ট, ক্রিকেটের খবর! শেষ পর্যন্ত যে ও প্রকৃতিস্থ ছিল না!'

'থাকলে কি আর এই কম করে!' দু-তিনজনে একসঙ্গে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'পুজোর পর একদিন মাত্র ক্ষিতীশের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। খুলে-মেলেই সেদিন নিজের অবস্থার কথা বলল। শেষ চেষ্টা করছিল বাস কণ্ডাক্টারির। ওই আমার সঙ্গে শেষ দেখা।'

'না, সে চাকরিও হয় নি।' বলল আর একজন।

'উঃ, এদিকে ওর জামাকাপড়ের যা অবস্থা হয়েছিল!'

'আর চেহারা?'

'পুলিস অ্যারেস্ট করেছে?'

'করবে না তো ছেড়ে দেবে নাকি? আর কার গলায় কোপ বসাতে যাচ্ছিল, কে জানে!'

'আশ্চর্য!' পিছন থেকে আবার একটা বড় রকমের ধমক শোনা গেল। 'আপনারা এখানে দাঁড়িয়ে কি সব আলোচনা করছেন, আমি প্রশ্ন করতে পারি কি?'

'আপনিও কাল ক্ষিতীশ হতে পারেন।' তেমনি ধমকের সুরে আর একজন বলল, 'আমরা নিম্নমধ্যবিত্তশ্রেণী কোথায় তলিয়ে যাচ্ছি, আজ সে কথা চিন্তা করুন। দাড়িয়ে টিপ্পনি কাটছেন— আরও কার গলায় ক্ষিতীশ দা বসাত।'

কেউ আর কতক্ষণ কথা বলল না।

'না, ও নিজে থানায় গিয়ে সব বলেছে। ক্ষিতীশকে সেখানে অ্যারেস্ট ক'রে পুলিস বাড়িতে এসেছে লাশ দুটো দেখতে।'

আর একটা পুলিসের গাড়ি সোঁত ক'রে বাঁ দিকের গলিতে গিয়ে ঢুকল, লক্ষ করলাম।

হেমন্তের দুপুর। বেশ শীত-শীত করছিল আমার।

গলাটা শুকিয়ে উঠছিল।

আতঙ্ক—আতঙ্ক তো বটেই! কেমন একটা বিমূঢ়তা, বিষণ্ণতা নিয়ে আরও কয়েক পা অগ্রসর হই।

'মূর্খ!' চাপা গলায় একজনকে আক্ষেপ করতে শুনলাম। 'দু-চার-পাঁচ টাকা চাইলে কি আমরা দিতাম না! নাকি কেউ আমাদের মধ্যে বিপদে পড়লে শত অভাব-অনটনের মধ্যেও একটা-দুটো ক'রে টাকা এ ওকে সাহায্য করছি না!'

'যা বলেছ, এক পাড়ায় আছি যখন।' একজন মাথা ও হাত নেড়ে বলল, 'আমি তো মাত্র সেদিন শুনলাম, ক্ষিতীশের চাকরি নেই, ভয়ানক বেকায়দায় পড়েছে।'

'পাড়ায় এত লোক—কে কার খবর রাখে, বল। আরে, লাহিড়িবাবুর ছেলে তনু যে এত বড় চাকরি করছে, একটা জবরদস্ত গেজেটেড অফিসার হয়ে বসে আছে, আমি কি ছাই এক হপ্তা আগেও খবরটা জানতাম! শুনলাম কাল, চায়ের দোকানে, টেপার মুখে। অথচ এক পাড়ায় আছি। এটা দুঃখের, কিন্তু ওটা তো সুখের খবর!'

'না, ক্ষিতীশের চাকরি নেই, ক্ষিতীশের দুরবস্থা, সে খবর আমরা রাখব কেন! আমরা শেয়ালদা ছুটি রিফিউজি দেখতে, কাঁদি, কাগজে রিপোর্ট ছাপি। আরে, পাড়ায় যে কত রিফিউজি গজাচ্ছে, সে খবর কে রাখে বল, কে ছাপছে তার রিপোর্ট কাগজে!'

জটলার ওধার থেকে একজন গলা বাড়িয়ে বলল, 'কই, এই যে একটা গ্র্যাজুয়েট ছেলে বেকার থেকে থেকে শেষে এমন কাজ করল, এর প্রতিকার কোথায়? হ্যাঁ, মুখ ফুটে সাহায্য চাইতে, ভিক্ষা করতে আধুনিক শিক্ষিত ছেলের বাধছিল বইকি!'

'যখন কিছু হবে না দেখলে', ভারি গলায় আর একজন বলল, 'দুটো পেটের ক্ষিধে ও নিজের হাতে শেষ করলে, এবার ওরটা শেষ করবে সরকারী জহ্লাদ। যা হ'ক ক'রে সমস্যার সমাধান হল, অস্বীকার করবে কে!'

'ছেলেটা একটু চাপা স্বভাবের ছিল। আর কেমন ব্রুডিং নেচারের।'

'ওরকম লোকই এসব কাজ করে—মানে, এদের পক্ষে খুন-সুইসাইড কোনটাই অসম্ভব না।'

'আমি চিন্তা করতে পারছি না, ভাবতেই পারছি না, কি ক'রে ক্ষিতীশ নিজের হাতে ওর—' সেই স্থান ত্যাগ করলাম।

'আহা!'

আরও দু পা অগ্রসর হতে স্ত্রীকণ্ঠ কানে এল। উদ্‌ভ্রান্তের মত, ক্ষিতীশের সব কথা জানতে পাব বলেই, আমি আর একটা রকের সামনে গিয়ে দাঁড়াই।

'মেয়েটাকে আগে কেটেছে।' একজন মহিলা আর একজন মহিলাকে বলেন, 'পরে সরযূকে কেটেছে।'

'হ্যাঁ, তিন দিন উনন জ্বলছিল না। ওদের পাশের বাড়িতে তো আমার ঝি যায় কাজ করতে! শুনে এল এইমাত্র। বুলির বাবা মানে ক্ষিতীশবাবু নাকি কাল সারা দিন বাড়িতে ছিল না। আমাদের ঝিয়ের কাছে সরযূ—ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রী—আট আনা পয়সা ধার চেয়েছিল।'

'দিয়েছিল ধার?'

'না, ঝি যাদের কাজ করে, তাদের ঘর থেকে ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রী পনর দিন আগে এক সের চাল ধার নিয়েছিল। চালটা ফেরত পাচ্ছিল না বলে ও বাড়ির গিন্নিমা নাকি সর্বদা ঘ্যানরঘ্যানর করত। বুলিদের অবস্থা কি দাঁড়িয়েছে টের পেয়ে ঝি ক্ষিতীশবাবুর স্ত্রীকে মানে বুলির মাকে আর পয়সা ধার দেয় নি।'

'হা!' বর্ষীয়সী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। 'অভাবে অভাবে পাগল হয়ে গিয়ে ছোঁড়া কি সর্বনাশ করল! কার অদৃষ্টে কি লিখেছে, কে জানে, ঠাকুর!'

'তোমরা চুপ কর।' গম্ভীর গলায় একজন পুরুষ বলল, 'এত সব কথা বলার জায়গা এটা না—এখানে দাঁড়িয়ে নয়। ঘরের পাশে খুন—পুলিস সেই বেলা বারটা থেকে ওই বাড়ি ঘিরে ফেলেছে তো বটেই, পাড়া পর্যন্ত ঘেরাও ক'রে ফেলেছে। সব এখন ভিতরে যাও দিকি নি!'

মেয়েরা ভিতরে চলে গেল।

আমিও আর সেখানে দাঁড়ালাম না।

তারপরেই এল ক্ষিতীশদের গলি।

গলি বাঁ দিকে রেখে ডান ফুট ধরে জায়গাটা পার হয়ে যেতে দেখলাম, ভিতরে একটা বাড়ির দরজা। আড়ালে চারজন পুলিস।

ক্ষিতীশের বাড়ি—বুঝতে কষ্ট হল না।

গলি, পুলিস, বাড়ির সামনের স্তব্ধতা ও শেষ-কার্তিক-দুপুরের নরম হয়ে-আসা এক ফালি রোদ পিছনে রেখে আমি ডান দিকে একটু মোড় নিয়ে

উলটো দিকের ফুটপাথে উঠে এলাম। বস্তুত, ক্ষিতীশদের গলির মুখটা পার হতে আমার খুব ভয় করছিল।

এখানে একটা পানের দোকানের সামনে দু-চারজনের ভিড়। দেখেই বুঝলাম, আলোচ্য বিষয় সেই একজনকে নিয়ে।

'যাক গে, ছেড়ে দে। বার আনা চোদ্দ আনা পয়সা কিছু না। কবে দিয়েছিলি? নিশ্চয় তখন ওর চাকরি ছিল? যখন ধার খেয়েছিল?'

পানওলা ঘাড় নাড়ল।

সিনেমা না কোথায় যাচ্ছিল বহু-লেড়কি নিয়ে। চৈত্র মাস, এতোয়ার বার। একটা ডাব খেল বৌ। দু খিলি পান। বাবু এক পাকিট কাঁচি কিনলে, একটা শেলাই। হিসাব ঠিক মনে আছে রামলগনের। চায় নি—কেননা, তারপর এই রাস্তা দিয়েই আর ক্ষিতীশবাবুকে যেতে দেখা গেল না। 'পাঁন্-ছ মাহিনা হবে।'

'চুপ কর্, চুপ কর্।' একটি যুবক ধমক দিতে পানওলা থামল। যুবকটি মৃদু গলায় পাশের আর একটি যুবককে বলল, 'ফাঁসি হবে?'

'নিশ্চয়ই!'

প্রথম যুবক চুপ ক'রে রইল।

এবার তৃতীয় যুবক কথা বলল।

'এই কাওআর্ডগুলো কেন বিয়ে করে? কেন বাচ্চা ডেকে আনে সংসারে?'

প্রথম ও দ্বিতীয় যুবক কথা কইল না।

'তার চেয়ে যদি তুই স্ত্রী-কন্যার আহার, ওদের সুখসংস্থানের ধান্দায় ব্ল্যাক মার্কেটিং করতিস, আর ধরা পড়ে এভাবে আজকের মত ফাঁসির আসামী হয়ে পুলিস হাজতে বাস করতিস তো তোকে বুঝি একটু সাবাস দিতুম। কি, নিজে দুঃখে ছিলি—সুখে আছে এমন দু-একটা লোকের গলায় দা বসাতে পারতিস।'

প্রথম যুবক এবার আক্ষেপ ও আক্রোশের সুর বার ক'রে বলল, 'না, মাইরি, পাড়ায় আমরা দশজন আছি—তুমি যে এমনভাবে তলিয়ে গেছ, চোখে-মুখে অন্ধকার দেখছিলে, সব খুলে-মেলে বললে কি আর এক বেলা দু বেলা ক'রে আমরা পাত পাততে দিতুম না—ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এর-ওর বাড়ি? যতই গরিব আছি না কেন!'

'সম্মানে বাধছিল।' দ্বিতীয় যুবক বলল।

'অপদার্থ!' তৃতীয় যুবক ধিক্কারের সুরে বলল, 'আরে, তুই যদি অপর নারীর লোভানিতে উন্মাদ হয়ে নিজের স্ত্রী ও কন্যাকে কাঁটা ভেবে কেটে শেষ করতিস, সেখানেও বুঝি সান্ত্বনা ছিল, ক্ষমা ছিল। কি বল, ব্রাদার?'

আর দুটি যুবক কথা বলল না। তারপর তিনজনেই চুপ ক'রে গলিটার দিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে পরে অন্য দিকে সরে গেল।

যেটুকু আলো ছিল, ততক্ষণে নিভে গেছে। দেখছিলাম, মই-কাঁধে লোকটা আলো জ্বালতে ক্ষিতীশদের গলিতে ঢুকছিল। সাদা-পোশাক সার্জেণ্ট হাত তুলে নিষেধ করতে সে আর সেদিকে অগ্রসর হল না।

'বাবু!'

পানওলার ডাকে চমকে উঠলাম।

'কি বলছিস?'

'বাবুকো খবর কাগজমে ছাপা হোগা?'

'হবে। হবে না, তুই বলতে চাস?' আমিও মূর্খ রামলগনকে একটা ধমক লাগিয়ে তৎক্ষণাৎ সেই স্থান ত্যাগ করলাম।

কিন্তু দেখা গেল, ক্ষিতীশের খবর শুনে পাড়ার লোকের চেয়েও কাগজ-ওয়ালারা বেশী চমকে উঠলেন। হৈ-চৈ করলেন।

রিপোর্টটা পড়েই চিফ রিপোর্টার আমার মুখের দিকে তাকিয়ে নির্ভীক গলায় ঘোষণা করলেন, 'আপনি চাকরি রাখতে পারবেন না, মশাই। শিক্ষিত বেকার যুবকের মতিচ্ছন্ন, আত্মহত্যা বা খুনখারাবির খবরের আকাল আছে কিছু নাকি দেশে যে, সারা দিন কাটিয়ে রাত নটার সময় আপনি এক আজগবী বিদ্‌ঘুটে খবর ধরে নিয়ে এলেন? যান, নিউজ এডিটার আপনাকে খুঁজছেন সেই সন্ধ্যা সাড়ে ছটা থেকে।'

ভীত কম্পিত পায়ে নিউজ এডিটারের কামরায় ঢুকতে তিনি প্রশ্ন করলেন, 'আপনি দমদম এরোড্রামে গিয়েছিলেন?'

'না।' বললাম, 'আমাদের পাড়ায় ভীষণ ব্যাপার ঘটেছে, মোহিতবাবু।'

মোহিতবাবু আকাশ থেকে পড়লেন।

'আপনার পাড়া? আগুন লেগেছিল? লরির নিচে চাপা পড়েছে কেউ? রেশনের টাকা যোগাড় করতে পারছিল না বলে কেউ আফিং খেয়েছে বুঝি? যান, এডিটার আপনাকে খুঁজছেন।'

ঢুকলাম খোদ সম্পাদকের ঘরে।

তিনি আমার রিপোর্টটা হাত দিয়ে ছুঁতে পর্যন্ত ঘৃণাবোধ করলেন।

'জাপানী মিশন এসে গেছে ক'লকাতায়। আমাকে এক্ষুনি প্রোফেসর কিমাচিস্নুর কোটেশন দিয়ে এডিটরিয়্যাল লিখতে হচ্ছে। পাড়ার খবরটা কাল এনে দিলে ক্ষতি ছিল না। যান, বাইরে যান।'

বুঝলাম, সামনের দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

বেরিয়ে আসার সময় সহ-সম্পাদকরা ফিসফিসিয়ে বলল, 'মশাই, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আজেবাজে খবর আনছেন। শুনে ম্যানেজার তার ঘরে লাফালাফি করছিল। কাগজে বাজে খবরের উপর বড্ড বেশী প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। প্রোপ্রাইটার নাকি কাগজ তুলে দেবে বলে শাসিয়েছে।'

'তার অর্থ বুঝছেন তো?' একজন বলল, 'আপনি ডুবেছেন, আমরাও ডুবব। বুড়ো বয়সে বেকার হব, তারপর ছেলেমেয়েগুলোকে দিনের পর দিন উপোস থাকতে দেখে একদিন পাগল হয়ে ওদের মাথায়ই বাড়ি বসাব হয়তো।'

'অর্থাৎ আপনার এক ক্ষিতীশের জন্যে আরও বিশটা ক্ষিতীশ তৈরী হবে এখানে।' পিছন থেকে কে একজন সহকারী বলল।

কথাটা শুনে সবাই একটু হাসাহাসি করল, তারপর গম্ভীর হয়ে গেল।

'তার চেয়ে উইমেন্স্ কলেজে সওয়া পাঁচটায় একটা বড় রকমের কালচারাল ফাংশন ছিল। দিব্যি সেটা কভার করতে পারতেন। সেই রিপোর্ট কন্সিডার ক'রে সেক্রেটারি আপনার চাকরি বাঁচাবার চেষ্টা করত। হি লাইক্স্ দোজ নিউজ।'

আমি নীরব থেকে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

পাড়ার কাছাকাছি আসতে হঠাৎ নীরদের সঙ্গে দেখা। এ পাড়ায় আমার একমাত্র পরিচিত বন্ধু। ভীষণ হাঁফাচ্ছিল সে। খপ ক'রে আমার হাত চেপে ধরে বলল, 'শুনেছিস? আমরা যা ভেবেছি, তা নয়—ব্যাপার অন্যরকম।'

'তার মানে?' বিস্ময়ে ওর মুখের দিকে তাকাই। ক্ষিতীশের গলির দিকে আঙুল বাড়িয়ে নীরদ ফিসফিসিয়ে বলল, 'অই দেখ, একটা সার্জেণ্ট এখনও মোটর-বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।'

ঢোঁক গিলে আমি তাই দেখলাম, তারপর আস্তে আস্তে বললাম, 'কি হয়েছে?'

'পুলিস এখনও স্টেটমেণ্ট নিচ্ছে।'

'কার?'

'পাশের বাড়ির লোকের।'

'কেন? পাশের বাড়ির সঙ্গে এই খুনের সম্পর্ক কি? অ, খুন করার সময় কেউ দেখেছে কিনা, চিৎকার শুনেছে কিনা, তার উইট্‌নেস?' অস্থির-ভাবে আমি নীরদের হাত চেপে ধরলাম।

যেন নীরদ ততক্ষণে শান্ত হতে পেরেছিল। আস্তে আস্তে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, 'পাশের অংশ এবং ক্ষিতীশদের অংশের মধ্যে একটা কমন দরজা আছে।'

'তা থাকতে পারে।' বললাম, 'তাতে হয়েছে কি?'

'কাল রাত্রে ক্ষিতীশ বাড়িতে ছিল না। আজ সকালে ঘরে ফিরেই নাকি কুঁজো-কলসী পরীক্ষা করছিল।'

'তারপর?'

'নিজের ঘরে জল না পেয়ে পাশের বাড়ি ছুটে গিয়েছিল জল খেতে।' বলে নীরদ এক ধরনের হাসল।

কেমন হেঁয়ালির মত ঠেকছিল ওর কথা। 'পাশের বাড়িতে জল খেয়ে ঘরে এসেই বুঝি ক্ষিতীশ ঐ কাণ্ড করল?' রুদ্ধস্বরে প্রশ্ন করলাম, 'ও বাড়ির কে ওকে জল দিয়েছিল? জানা গেছে কিছু?'

'এ গার্ল, অ্যান এজেড গার্ল। ঐরকম রিপোর্ট পেয়েছে পুলিস।'

বেশ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে নীরদকে প্রশ্ন করলাম, 'কে দেখেছিল? পুলিস এত খবর কার কাছে পেল?'

'একটি ঝি। কাদের বাড়ির ঝি, এখনও নাম জানা যায় নি।' একটু থেমে পরে নীরদ বলল, 'আসল কথা—যা বলাবলি করছিলাম আমরা, তা নয়। এই খুনের পিছনে শুধুই অভাব-অনটনের অশান্তি না, একটা বড় রকমের রোমান্স জড়ানো আছে, পুলিস তার আভাস পেয়েছে। কি বলিস?'

মাথা নেড়ে ছোট একটা নিশ্বাস ফেলে বললাম, 'আস্তে কথা বল।'

আমার বন্ধু

হঠাৎ অমরেশের সঙ্গে দেখা। আমার বন্ধু অমরেশ পালিত। হ্যাঁ, দুপুরবেলা। চৈত্র মাস। পেভ্‌মেণ্ট তেতে আগুন হয়ে গেছে, টের পাচ্ছিলাম। দাঁড়ানো যায় না।

অমরেশকে দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম।

কেননা, সেটা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দরজা।

অমরেশের পিছনে মহানগরীর পরিস্ফীত বিশাল সেই হর্ম্য। যার কক্ষে কক্ষে অসংখ্য রোগীর কাতর নিশ্বাস ওঠা-নামা করছে। যার দরজায় পরিষ্কার রক্ত-অক্ষরে লেখা আছে BLOOD BANK।

রক্তের সম্পর্কের এমন কে আছে এখানে অমরেশের যে, বড় অবেলায় অফিস-কাছারি ফেলে হাসপাতালে ছুটে এল!

বেলা বারটার ঘণ্টি পড়েছে, বুঝলাম।

টিফিন-কেরিয়ার ও ফলমূল হাতে রোগীর আত্মীয়স্বজন-বন্ধুবান্ধব রোগী দেখতে এল। কেউ দেখা শেষ ক'রে বেরিয়ে আসছে। দেখলাম, অমরেশ বেরিয়ে এল।

গৈরিক হর্ম্যের অসংখ্য সিঁড়ির মুখচুম্বন ক'রে পিচ-ঢালা কালো চিক্‌চিকে রাস্তাটা সাপের জিহ্বার মত ট্রাম-লাইনের কাছাকাছি যেখানটায় এসে মিলেছে, সেখানে অমরেশ এসে আমার হাতে হাত মিলাল।

খোঁচা-খোঁচা দাড়ি।

ছিন্নপ্রায় ময়লা গায়ের কাপড়চোপড়।

না, তা আমায় বিস্মিত করে নি। বিস্মিত হয়েছিলাম ড্যালহৌসির এক বন্ধুকে হাসপাতালের সামনে দেখে। কার অসুখ, কাকে দেখতে এল? দেখা শেষ ক'রে বাড়ি ফিরবে, নাকি ওই পোশাকে ও আবার কাজে যাচ্ছে? কষ্ট হল, কৌতূহল হল, আর একটু ভয়, সন্দেহ। অমরেশকে ভয়ংকর বিমর্ষ দেখছিলাম।

বলে রাখি, অনেক দিন পর অমরেশের সঙ্গে এই দেখা। একই ফার্মে ওর সঙ্গে আমি সাত বছর কাজ করেছি। সেখান থেকে আমার চাকরি যাওয়ার

পর সেই মাইনের অধেক মাইনেয় এক ছাপাখানায় প্রুফ-রিডারের কাজে আছি। না, তা নয়—সম্প্রতি আমার মাতৃবিয়োগ ঘটেছে। এবং ছাপাখানায় এক দুপুরের ছুটি নিয়ে আসন্ন মাতৃশ্রাদ্ধের আয়োজনস্বরূপ একখানা থান কিনতে বেরিয়েছিলাম।

কাপড়ের দোকান থেকে কাপড় কিনে হাঁটতে হাঁটতে চলে এসেছিলাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের দরজায়—ট্রাম ধরব ভেবে। অমরেশ আমায় দেখে হাসল।

'কি ব্যাপার?'

বললাম, 'মা স্বর্গে গেছেন।' ঢোঁক গিলে প্রশ্ন করলাম, 'কে আছে তোমার এখানে, হাসপাতালে কেন?' বলে ওর হাত ধরলাম।

অমরেশও আমার হাতে হাত রেখে বন্ধুত্বের চাপ দিল।

কিছু না বলে ট্রাম-লাইনের দিকে চেয়ে নিশ্বাস ফেলল।

কথাটা ঘুরিয়ে বললাম, 'তোমার স্ত্রী ও কন্যাটি ভাল আছে, অমরেশ?'

অমরেশ আমার চোখে চোখ রেখে হাসল।

'স্ত্রী ও কন্যা ছাড়া মানুষের আর কেউ থাকতে নেই?'

উত্তর দিতে পারলাম না তার কথার।

দেখলাম, অমরেশ উদাস দৃষ্টি মেলে পাশের ফলের দোকান দেখছে। একটা ডালার উপর সাজানো শুকনো ডালিম, লেবু। চৈত্রের রোদ লেগে লেগে ফলের খোসা শুকিয়ে গেছে।

'ট্রামের দেরি আছে—চল ওই ফুটপাথে।' অমরেশই প্রস্তাব করল।

বললাম, 'চল।' আমি মার থানের বাণ্ডিলটা ডান বগল থেকে বাম বগলে নিই।

অমরেশ চলছিল লাইট পোস্টের ছায়ার দিকে, আমি ওকে টেনে নিয়ে গেলাম পানের দোকানের সামনে।

জলে-ভেজা পান ও সবুজ ডাবে সাজানো ছোট্ট ঠাণ্ডা দোকান। হাসপাতালের দরজায় যতক্ষণ ছিলাম, গা যেন পুড়ে যাচ্ছিল। পা ফেটে যাচ্ছিল। পানের দোকানের সামনে এসে স্বস্তিবোধ করলাম দুজনই।

হাল্‌কা গলায় বললাম, 'সিগারেট খাবে?'

'আমার কাছে কিন্তু পয়সা নেই।' সরল গলায় অমরেশ দৈন্য প্রকাশ করল।

বললাম, 'পয়সা আমি দিচ্ছি।'

দেখলাম, অমরেশ আমার দিকে নয়, স্থির স্তব্ধ দৃষ্টি পাঠিয়ে দিয়েছে আবার সেই ফুটপাথের ডালার দিকে। চৈত্রের রোদ লেগে চকচকে নীল আঙুরগুলো বিষাক্ত ফলের মত ধূসর হয়ে পড়ে আছে যেখানে।

'কাল বিকেলে ফল কিনে দিতে সবটা আধুলি বেরিয়ে গেল।' অমরেশ ঘাড় ফিরিয়ে আমার চোখে চোখ রাখল।

বললাম, 'কেমন আছে রোগী—রোগিনী—' বলতে বলতে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম।

একটু চুপ থেকে অমরেশ আস্তে আস্তে বলল, 'ওদিকটায় খাটিয়া কিনতে পাওয়া যায়—মির্জাপুর স্ট্রীটে?' মির্জাপুর স্ট্রীটের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে অমরেশ বলল, 'কই, সিগারেট দাও!'

আমি নিঃশব্দে ওর হাতে সিগারেট তুলে দিলাম।

'এই আধ ঘণ্টা আগে চলে গেছে। তুমি বেরিয়েছ মার শ্রাদ্ধের আয়োজনে, আমি হাসপাতাল থেকে বেরোলাম শ্মশানের আয়োজনে।' অমরেশ সিগারেট ধরাল।

'ও!' আমার মুখ দিয়ে অস্ফুট উচ্চারণ ছাড়া আর কিছুই বেরোল না।

'কাল সারা রাত খুব জ্বালিয়েছে। মৃত্যুযন্ত্রণা, বুঝলে না? রাত তিনটের সময় অক্সিজেন দেয়। তখনই আমি সব আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম।'

'কোন ওআর্ডে ছিল?' প্রশ্ন করলাম।

'সার্জিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট। আর কিছু জানতে চাও?' বলে অমরেশ এক গাল ধোঁয়া ছাড়ল আকাশের দিকে মুখ ক'রে।

দেখলাম, অমরেশের চোখের কোলে কালি, রাতজাগা শুকনো রুগ্ন চেহারা।

'তবু একটা সান্ত্বনা—নার্স ছুটো, মাইরি, খুব কাজ করেছে।' অমরেশ আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল।

কিন্তু তখনও আমি জিজ্ঞেস করতে পারলাম না, কে—কে ছিল হাসপাতালে? যার মৃত্যুশয্যার পাশে অমরেশ রাত কাটিয়েছে, এখন এই ভরদুপুরে কাজকর্ম সব ফেলে শ্মশানযাত্রার জন্যে তৈরী হচ্ছে? কে সে?

স্ত্রী ও কন্যাটি সুস্থ আছে ওর—কথার ধরনে বোঝা গেছে। তা ছাড়া, আমি যত দূর জানি, জানতাম—বাপ, মা, ভাই, বোন বলতে অমরেশের আশেপাশে কেউ ছিল না। নেই।

অমরেশ বলল, 'তোমার ট্রাম আসছে।'

সে কথা কানে না তুলে আমি বললাম, 'তোমার খাওয়া-দাওয়া হয় নি নিশ্চয়! কিছু ফলমূল, একটা ডাব'—আমি পকেটে হাত ঢোকাচ্ছিলাম।

অমরেশ বলল, 'রাখ তোমার খাওয়া-দাওয়া!'

আমার হাতে হাল্‌কা টান দিয়ে সে বলল, 'চল ওই ফুটপাথে!'

নিঃশব্দে বন্ধুর পদানুসরণ করি।

আমার পায়ে যেমন জুতো ছিল না, তেমনি, দেখলাম, অমরেশের পা দুটো ও খালি। কিন্তু ওর পা, পায়ের গোড়ালি ফেটে খান্‌খান্‌ হয়ে গেছে। ক্রমাগত ময়লা ও গরম লেগে লেগে যা হয়। অমরেশের তাই কি?

কিন্তু লক্ষ করলাম, এমন গরম সিমেণ্ট ও আগুনের মত গন্‌গনে গলন্ত পিচ অমরেশ স্থির অবিচল পায়ে হেঁটে পার হল। যেন মোটেই লাগছে না।

ভাবলাম, মানুষ যখন শোকাভিভূত হয়, তখন অন্য অনুভূতি তার ভোঁতা হয়ে যায়। শৈত্য, তাপ, ক্ষুধা, তৃষ্ণার বোধ বা অকপটে বন্ধুর কাছে পয়সা না-থাকা ঘোষণা করার সংকোচ কিছুই থাকে না।

না, অমরেশের কোনও ব্যবহারে আমি অবাক হই নি। অবাক হলাম এবং খুব অস্বাভাবিক ঠেকল, গাড়ি স্টপেজে এসে দাঁড়াতে হঠাৎ যখন ও বলল, 'চল, আমিও ট্রাম ধরব।' এবং দেখলাম, সত্যি সত্যি, প্রায় আমার সঙ্গে সঙ্গে, ট্রামের হাতলে ঝুলে অমরেশ দিব্যি গাড়িতে উঠল।

অবাক হয়ে ওর মুখের দিকে তাকাবা মাত্র অমরেশ ফিক ক'রে হাসল, অনেকটা ছেলেমানুষের মতন, বলল, 'যাক গে, আর পারি নে, বাবা! সারা রাত তো ছিলাম! আত্মীয়স্বজন এসে গেছে—শ্মশানের কাজ ওরা করুক।'

বুকের ভিতর থেকে একটা ভার নেমে গেল আমার। অমরেশের হাসি অত্যন্ত স্বাভাবিক ঠেকল এবার।

'তাই বল—' হাল্‌কা গলায় বললাম, 'তোমার কেউ না!'

গাড়ির জানলার ওপারে অপস্রিয়মাণ হাসপাতালের দিকে শেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে অমরেশ তেমনি হাসতে হাসতে বলল, 'যদি বলি আমারই সব, আমিই সব?'

কথার শেষে অমরেশ কেমন একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

চুপ ক'রে রইলাম।

একটু পর একটা চোখ ছোট ক'রে অমরেশ ফের হাসতে হাসতে বলল, 'দুঃখী কেরানীর জাত বলে কি সত্যি আমাদের কেউ থাকতে নেই হে, ভায়া?'

'কি রকম ?' দুঃখের চেয়ে আমার কৌতূহলের মাত্রা বেড়ে গেছে তখন। বন্ধুর কাঁধের কাছে কাঁধ নিয়ে বললাম, 'কে ? শুনি না !'

'কালীঘাটে যাদের সঙ্গে এক বাড়িতে ভাড়াটে ছিলাম—জলধরবাবুর মেয়ে।' আমার কানের কাছে মুখ ঠেকিয়ে অমরেশ ফিসফিসিয়ে বলল, 'গলায় কাঁটা বিঁধে হাসপাতালে এসেছিল।'

'তুমি তো আজকাল শ্যামবাজারে আছ !' আস্তে আস্তে বললাম।

'আছি তো হয়েছে কি—মন থেকে সব মুছে গেছে ?' গলা পরিষ্কার ক'রে অমরেশ আর এক দফা হাসল। 'কালীঘাটের বাড়ি কি আর সাধ ক'রে ছেড়েছিলাম—ওই বৌয়ের জন্যেই ! টের পেয়ে বৌ শেষটায় বাড়াবাড়ি শুরু করলে কিনা—হি-হি—কিন্তু মনের মানুষ, বুঝলে ব্রাদার, দূরে সরে এলেও মনে থেকে যায়। অ্যাদ্দিন তো আর সুযোগ পাই নি দেখা করার—হাতে এখন অঢেল সময়, তাই মরবার সময় একটু কাছে থেকে-টেকে—' সিগারেটে শেষ টান দিয়ে অমরেশ আগুনটা ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিলে। বুঝলাম, বুঝে চুপ ক'রে রইলাম।

অমরেশ বলল, 'কেরানীর জীবনে রোমান্স—ভেবে তুমি অবাক্ হচ্ছ নিশ্চয় ?'

হেসে বললাম, 'না, তা নয়। ভাবছিলাম, এই অফিস-টফিস কামাই ক'রে—'

'সে ভয় নেই।' খুকখুক ক'রে কাশল অমরেশ, 'অনেক দিন চাকরি গেছে, সেজন্যেই তো হাতে এখন প্রচুর সময় !'

চমকে বন্ধুর মুখের দিকে তাকাই।

অথচ খুবই স্বাভাবিক ঘটনা। নতুনত্ব নেই। এবং অমরেশের বেশভূষা ও দৈন্য দেখে অনেকক্ষণ আগেই আমার অনুমান করা উচিত ছিল।

হাত ঘুরিয়ে দেউলে গলায় বন্ধু বলছিল, 'করব কি ! কে দেয় আমায় চাকরি ? ঘুরে ঘুরে পায়ের তলা ক্ষয়ে গেছে—পেয়েছি কাজ ? তার চেয়ে—' আমার কানের কাছে মুখ এনে পরে অমরেশ ফিসফিসিয়ে বলল, 'বাড়িতে বসে বৌয়ের চিৎকার আর মেয়ের কান্না শোনার চেয়ে রাস্তায়, হাসপাতালে ঘুরে এক-আধটু রোমান্স যদি করা যায়, মন্দ কি ! অপরাধ আছে কিছু ? কথা বলছ না যে !' টেনে টেনে হাসল কতক্ষণ অমরেশ।

আমি চুপ। এর উপর আর কথা ছিল না।

গাড়ি বিবেকানন্দ রোডের মোড়ে এসে গেছে। সিট ছেড়ে অমরেশ উঠে দাঁড়ায়।

'এখানেই নামছ?' প্রশ্ন করলাম।

'হ্যাঁ।' ঘাড় নেড়ে অমরেশ বলল, 'বুঝলে না, নিমতলা পর্যন্ত চলছিলাম ওকে নিয়ে, তাই ভাল ছিল—শ্মশানটা একবার ঘুরে এলে মন্দ ছিল না। না খেয়ে খেয়ে এমনি তো সব আমরা শ্মশানে চলেছি শ্মশানযাত্রীর দল।' আমার কাঁধে শেষবার ঝাঁকুনি দিয়ে অমরেশ বলল, 'তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে ভালই হল। চলি, ব্রাদার।'

যেন অনেক দুঃখ পেয়ে, অনেক যন্ত্রণা ভোগ ক'রে ক'রে অমরেশ দার্শনিক হয়ে গেছে। ভাবলাম। গাড়ি থেকে নামবার সময় কথাগুলি বলতে বলতে লক্ষ করেছিলাম, অদ্ভুত এক নির্লিপ্ততা ফুটে উঠেছিল ওর চোখে-মুখে।

কিন্তু আমার সেই বিমূঢ় ভাব রইল না।

ট্রাম বিডন স্ট্রীট পার হতে মাথায় বজ্রাঘাত হল। মার শ্রাদ্ধের বাজার ক'রে আড়াইটে টাকা বাঁচিয়ে রেখেছিলাম রেশনের জন্যে।

সামনের সিটের এক ভদ্রলোক আমার রকমসকম দেখে টের পেলেন। 'গেছে বুঝি ট্যাঁকখানা?' ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসে গলা বড় করলেন। 'অত ঘেঁসাঘেঁসি ক'রে বসলেন—তখনই জানি, একটা কিছু ঘটবে। আর একদিন এই কাণ্ড করেছিল শালা। হ্যাঁ, এই শ্যামবাজারের ট্রামে। আমি ওকে চিনি।'

'আর একদিন কি ও মেডিক্যাল কলেজের দরজায় ট্রাম ধরেছিল?' কেন জানি, ভয়ংকর ইচ্ছা হচ্ছিল ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করি। পারলাম না। জানলার বাইরে চোখ রেখে চুপ ক'রে রইলাম।

বনানীর প্রেম

খুব হাওয়া খেলত আমাদের ঘরে। প্রচুর আলো। এত আলো-হাওয়ায় সত্যি মন কেমন হুহু করত। আমরা অবোধ অবলা। তাও মফস্বলের মেয়ে। পাঁচজন এক জায়গায় জড়ো হয়েছি জীবিকা অর্জনের জন্য। মফস্বল ছেড়ে যেদিন মহানগরীর দিকে যাত্রা করেছিলাম, ভাবছিলাম, কত না লোক, গাড়ি, বাড়ি আমাদের চোখ ধাঁধিয়ে দেবে, বিব্রত করবে, ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুলবে পদে পদে। তার কিছুই হল না, কিছুই দেখলাম না। পড়ে রইলাম এই শালখের মাঠে।

আমাদের এক দিকে গঙ্গা, এক দিকে আকাশ। আকাশের গায়ে দুটো চটকলের চিমনি। একটা তালগাছ ঘরের সামনে, আর উপর দিয়ে, আমাদের চালার ঠিক উপর দিয়ে চলে গেছে অনেকগুলো টেলিগ্রাফের তার।

বাঁকুড়ার আমি, রংপুরের মলিনা, বরিশালের রেণু, সিলেটের সুশীলা আর এখানকারই কোন্ শ্যামনগরের শ্যামলী। এই পাঁচজন আছি এখানে।

আমাদের ঘর মানে শিক্ষয়িত্রী-নিবাস। উপরে টালি, নিচে সিমেণ্ট। টিনের বেড়া। দরজা-জানলাগুলো আম কি জাম কাঠের, ঠিক বোঝা যেত না। ঘরের দৈর্ঘ্য উনিশ হাত, প্রস্থ এগার। পাঁচটি দড়ির খাট (এখানে এসে শুনছি, এর নাম খাটিয়া) পাঁচজনের জন্যে।

পাঁচটি শিক্ষয়িত্রী। গ্র্যাজুয়েট দুজনের মাইনে ষাট আর মাগ্‌গি ভাতা কুড়ি। তার নিচে যারা, তাদের পঁয়তাল্লিশ, যোগ পনর ক'রে।

শালখের নতুন মেয়ে-স্কুল। ছাত্রী কম, আয় অল্প।

অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা না করলে ইস্কুল পটল তুলবে, বেশী দামের মাস্টারনী রাখব না এখন। কর্তৃপক্ষের হুমকি শুনছি তিন বছর ধরে। আমরাও মাইনে বাড়াবার জন্যে পা বাড়াই নি, দাম বাড়াবার জন্যে মুখ খুলি না কখনও।

কেবল ভয় হত, খালি ভাবতাম, ইস্কুল যদি বাস্তবিকই পটল তোলে, আমরা যাব কোথায়, কতখানি আমাদের যোগ্যতা! বাদলার দিন, আর সেদিন যদি ছুটির দিন থাকত, যে যার খাটিয়ায় বসে চুপচাপ চিন্তা করতাম। কেবল খাব কি নয়, খাওয়াব কি। বস্তুত, আমরা যে খাওয়াতেই ছুটে এসেছি। মাসের শেষে আমার টাকা গেলে মা খাবে, রেণুর ঘাড়ে আছে অন্ধ ভাই আর তাঁর স্ত্রী।

সুশীলার মূর্খ বিধবা বোন তিনটি নাবালিকা নিয়ে সুশীলার মুখের দিকে চেয়ে। মলিনার বুঝি বাতে অচল অপুত্রক বৃদ্ধ পিতা।

এমনি সব।

হিতৈষী আত্মীয়েরা বলাবলি করছিল আমাদের শুনিয়ে। ছেলে নেই যার, মেয়ের রোজগার খেয়ে এদিনে বাঁচতে হবে তাকে; আর ভাই না থাকলে ভগিনীই সম্বল। উপায় কি! এখন এই চলছে ঘরে ঘরে। পয়সা রোজগার নিয়ে কথা।

হিতৈষী আত্মীয়ের মুখে শুনেছি, মেয়েরা ঘরের বাইরে পা বাড়ালেই পয়সা আনতে পারছে সুন্দর। ওদের টাকা খুঁজতে হয় নাকি, টাকা ওদের খুঁজছে! এটা মেয়ের যুগ। একটু সাহস থাকলেই হল।

শহরতলির একটা স্কুলের মাস্টারনী হয়ে কথাটা মনে পড়ে। বড় শহরের খিড়কির দরজায় আছি আমরা। পুরোপুরি সাহস হল না বলে শহরের ভিতরে ঢুকবার অধিকার রইল না।

বলতে কি, এখনও মাথার উপর টেলিগ্রাফের তারগুলোর দিকে চোখ পড়লে চমকে উঠি। বাড়ির কথা মনে হয় কেন জানি। বাড়ি ছেড়ে এসেও বাড়ির সঙ্গে বাঁধা পড়ে আছি, এই কেবল মনে হয়। এটা ভাল কি মন্দ—বিচার ক'রে দেখতে যাই না। তবে আমাদের অগ্রসর অসম্ভব—এ সম্পর্কে পাঁচজনই নিশ্চিন্ত ছিলাম। ইস্কুলটা কোনমতে টিকে থাকলে শালখের মাঠের এই বোর্ডিং-ঘরে ইঁদুরের মত পাঁচটি অনূঢ়া অসহায় গরিব শিক্ষয়িত্রী যা-হ'ক ক'রে জীবন কাটাতে পারব—এই আশা ছাড়া আর কোনও আশা ছিল না কারও।

ইস্কুলের সময় পড়াই, বাকি সময় ঘরে কাটে।

নিজেদের রান্না নিজেদেরই করতে হয়। এ বেলা মাছ, ও বেলা ডাল। মাছ কি ডাল না থাকলে পেঁপের ডালনা। ঘরের পিছনে সেক্রেটারি বা স্কুলের যিনি হর্তাকর্তা আমাদের জন্যে আগে থাকতেই একটা পেঁপের জঙ্গল তৈরি ক'রে রেখেছিলেন। সত্যি, ডালনার বাটি সামনে নিয়ে সুশীলা ও রেণুর যা চেহারা হত, দেখলে কষ্ট হত। কেননা, আমাদের মধ্যে ওরা দুজনই ছিল সবচেয়ে ছোট। কুড়ির এপারে। আমরা অবশ্য অনেকদিন কুড়ি পার হয়ে গেছলাম—তিনজন।

তবে বয়সের এই পার্থক্য আমাদের শরীর দেখে বিশেষ বোঝা যেত না। ছাব্বিশের শ্যামলী আর সতরর সুশীলার শারীরিক গঠনের বিশেষ পার্থক্য ছিল কি! গরিবের ঘরের মেয়েরা কষ্টেসৃষ্টে কলেজের পড়া সাঙ্গ ক'রে যখন

চাকরি করতে নামে, তখন দেখতে প্রায় সব ক'টি কেমন একরকম হয়ে যায়। এক চেহারা—বয়সের সীমারেখা মিলিয়ে গেছে। আমরা, আমরা ভাবতেই পারতাম না, কার যৌবন এল—কার চলে গেছে। কেননা, জাজ্বল্যমান হয়ে যৌবন কারওর শরীরে বুঝি কোনদিন দেখাই দেয় নি।

যৌবনহীন কুমারী-জীবন কত নিষ্প্রভ, কত অনুতপ্ত, আমরা নিজেদের দিকে তাকালেই তা অনুভব করতে পারতাম।

আর, একজনেরও স্বাস্থ্য ভাল ছিল না। আমরা, বড়রা, ভুগছিলাম রক্তের চাপে, নানারকম জটিল স্ত্রীরোগে। সুশীলা ও রেণু ওই বয়স থেকেই ভুগছিল টন্‌সিল, ফ্যানিনজাইটিস নিয়ে। নয় তো দাঁত কি চোখের অসুখ।

শরীরের এই সম্বল, এই সম্পদ নিয়ে আমরা মাঠের মাঝখানে কোনরকমে যেন জেগেছিলাম। বর্ষার আকাশের মত পৃথিবীটাও ধূসর মনে হত।

এমন দিনে হঠাৎ ও এল। বর্ষার শুরুতে সবাই আমরা একবার ক'রে ইনফ্লুয়েন্‌জায় ভুগে উঠেছি মাত্র।

শনিবারের বিকেল। বেশ মনে আছে। বারান্দায় একটা লম্বা বেন্‌চের উপর বসে পাঁচজন কচি পেয়ারা চিবোচ্ছি নুন দিয়ে মুখের স্বাদ আনবার জন্যে। কুলির মাথায় একটা সুটকেস্ ও বেডিং চাপিয়ে মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল।

নতুন মিস্‌ট্রেস ? পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। ইস্কুলের এই দুঃসময়ে নতুন কোনও শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত হয়েছে বা হবে, আমরা যে জানতাম না!

বনানী হাসল মৃদু। অল্প মাথা নেড়ে বলল, 'না, হেড মিস্‌ট্রেস। শালখে গার্লস স্কুলের নতুন হেড মিস্‌ট্রেস হয়ে এসেছি আমি। আপনাদের সঙ্গে থাকব।'

নাম শুনে ঘুম পেয়েছিল। চেহারা দেখে চমকে উঠলাম। হঠাৎ, কেন জানি, খেয়াল হল, সেক্রেটারি আমাদের বোর্ডিংএর একটা বেড়া দিয়ে ঘেরাও ক'রে দেন নি কেন। এমন সুন্দর ও!

ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রীর এত রূপ কে কবে দেখেছে!

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'আপনার জন্যে তো আলাদা কোয়ার্টার আছে! সুষমাদি, যিনি আগে হেড মিস্‌ট্রেস ছিলেন, সেখানেই তো থাকতেন।'

'কেন, আপনাদের অসুবিধা হবে আমি এখানে থাকলে?' পরিচ্ছন্ন সুন্দর দাঁতে মেয়েটি আবার হাসল।

উজ্জ্বল, স্বাস্থ্যের লাবণ্যে পরিপূর্ণ এক জোড়া কালো চোখ ঘুরে-ফিরে আমাদের মুখের উপর ভেসে বেড়াল একটুক্ষণ।

'আলাদা কোয়ার্টারে থাকা মানে খামকা কতগুলি টাকা নষ্ট।' বনানী গম্ভীর হয়ে বলল, 'আপনারা পাঁচজন এখানে আছেন, থাকতে পারছেন বেশ—আমার কেন অসুবিধা হবে?'

আমরা পাঁচজন চুপ ক'রে রইলাম। ভাবছিলাম সুষমা সান্যালের কথা। হেড মিস্‌ট্রেস তো বটেই, অহংকারে নিজের বাসা ছেড়ে ভুলেও একদিন উঁকি দিতে আসেন নি আমাদের ঘরে।

একটু থেমে বনানী বলল, 'আপনি নয় তুমি। তোমাদের চেয়ে আমি বয়সে কি বড় হব?' আমাদের দিকে ও তাকাল।

মনে হল, অন্তত আমাদের তিনজনের চেয়ে বনানী বয়সে ছোট হবে।

তবু নতুন লাগল এই মেয়ের কথা। হেড মিস্‌ট্রেস তো বটে!

কিন্তু বনানী আধ ঘণ্টাও প্রধানা শিক্ষয়িত্রী হয়ে রইল না। বাক্স-বেডিং গুছোতে গুছোতে হাসল, অজস্র কথা বলল।

'মন্দ কি শহরতলি! বেশ নিরিবিলি। আমার খুব ভাল লাগছে জায়গাটা। শহরের সোরগোল এখান অবধি পৌঁছয় না, আবার ইচ্ছে করলে বিশ মিনিটে তুমি ক'লকাতার একেবারে মাঝখানে গিয়ে পড়তে পার।' জানলার বাইরে চোখ রেখে বনানী ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। 'অবিশ্যি ক'লকাতা ছাড়লে আমার চলবে না। শেষ পর্যন্ত ওখানেই চাকরি করতে হবে আমায়। আপাতত দেখা যাক।'

বনানী আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'ওটা বুঝি রান্নাঘর?'

মাথা নেড়ে পাচজন সায় দিলাম। 'নিজেদের রান্না নিজেরাই করি। ঝি-চাকরানী নেই।' বললাম।

'তাতে কি!' বনানী ক্ষীণ হাসল। 'পালা ক'রে এক-একজন এক-এক দিন রাঁধব।'

এই প্রথম আমরা দেখেছিলাম শহরের একটি মেয়ে। বাঁ মণিবন্ধে তেঁতুল-বিচির মত ছোট্ট ঘড়ি। সাপের গায়ের মত কালো চকচকে বেণী ঘাড় ঘুরে বুকের উপর এসে নেমেছে। কাগজের মত পাতলা সাদা চটি পায়ে, নিরাভরণ, ছিমছাম।

এই প্রথম আমরা চমকে উঠলাম। একটি মেয়ের দেহে সত্যিকারের যৌবন থাকলে সে চাকরি করবে, খেটে খাবে, যেন বিশ্বাস হয় না। বিশ্বাস করতে বাধল বনানীকে দেখে। চায়ের বাটি হাতে নিয়ে ও ঘুরতে লাগল। আমাদের কি কি জিনিস আছে। কেমন ঘর।

বললাম, 'মেঝেটা ভারি নিচু। জায়গাটা এমনিও খুব স্যাঁতসেতে।' কেমন কষ্ট হচ্ছিল ও এখানে থাকবে ভেবে। নরম তুলতুলে, সুখ দিয়ে গড়া নতুন একটি শরীর। আশ্চর্য ছোট লাগছিল ওকে ওই বয়সেও।

বনানী কিছু বলল না। যেন ওটাও ও সহ্য করবে এমন করল মুখের ভাব।

রাত্রে খেতে বসে পাতের সামনে কেবল পেঁপের ডালনার স্তূপ দেখে ও মুখ কালো করল না একটু। হাসিমুখে সবটুকু খেল।

কে জানত, শহরের মেয়ে এত সরল হয়, এমন মিশুক। খাওয়ার পর একটি-একটি ক'রে ও সব বলল। এই ওর এখানে প্রথম চাকরি করতে আসা। বাধ্য হয়ে। একরকম জোর ক'রে বাবা ও দাদাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে।

অবাক হয়ে আমরা বনানীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। কে বলবে, ও আমাদের নতুন হেড মিস্ট্রেস। একটি মেয়ে। একটি মেয়ে তার যৌবনের সবটুকু তেজ, অভিমান, ইচ্ছা ও উচ্ছলতা নিয়ে স্রোতের ফুলের মত ভেসে এল শালথের মাঠে। আমাদের মাঝখানে।

বাবা জজ। দুই দাদা ব্যারিস্টার। বনানী বলল, শহরের সবচেয়ে সৌখিন অঞ্চলে ওদের বাড়ি। হ্যাঁ, খুব আদরের মেয়ে ও। ভারি মর্যাদা-সম্পন্ন ঘর। সারা বাড়িতে ও-ই একমাত্র মেয়ে।

ঘরে টিউটর রেখে ওর এম এ পাস। কষ্ট ক'রে পড়তে যেমন হয় নি, তেমনি ঘরের কোনও কাজেও তার কোনদিন হাত লাগাতে হয় নি। ছবি এঁকেছে, গান শিখেছে বসে বসে। সত্যি সে সুখে ছিল!

চাঁপার কলির মত হাতের দশটি আঙুল আমাদের চোখের সামনে মেলে ধরে বনানী গভীর দুঃখে হাসল। 'হয়তো মেয়েদের আমি পড়াতেও পারব না, ভাই—তবু জেনে-শুনে এসেছি এখানে। আপাতত এই স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগিরি করব। আমার এখন কিছু টাকার দরকার। পরে ভাল চাকরি জুটবেই।'

আমরা ঢোঁক গিললাম। শুনে চুপ ক'রে রইলাম।

'হ্যাঁ, ক'লকাতায় ফিরে গিয়ে আর দশটি মেয়ে যেমন ভাল ভাল চাকরি করে, তেমন একটা চাকরি নেব। অর্থাৎ পাকাপাকিভাবে চাকরির খাতায় নাম লেখাব আর কি!' খিলখিল হাসল ও। খাওয়া শেষ ক'রে ও হাত তুলে বসে ছিল। কেন ও এল, কিসের দুঃখ? কি একটা আন্দাজ করেছিলাম আমরা। কপালে দুটো রগ বাঁ হাতের আঙুল দিয়ে টিপে ধরে বনানী হঠাৎ একটু সময় চুপ ক'রে ছিল।

আমাদের জীবন মধুশূন্য। পৃথিবীর সব মেয়েই জীবনের মধু, মধুর শখ

স্বপ্ন হারিয়ে আমাদের মত ভিখারিণী সেজে বসে নেই। বনানীকে দেখে আজ মনে পড়ল হঠাৎ।

'মেয়েরাই মেয়েদের দুঃখ বোঝে,' আস্তে আস্তে বলল ও, 'আর বোঝে মা। আজ যদি মা বেঁচে থাকত, মাস-মাস ক'টা টাকার জন্যে আমাকে চাকরি করতে হত না!' হাত ধুয়ে বনানী পায়চারি করছিল আমাদের সামনে।

রুদ্ধশ্বাস হয়ে শুনছিলাম সব।

'বাবাকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছি, চাকরি ক'রে আমি মনোজিৎকে টাকা পাঠাব। তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের কাছে থাক। আমায় বাঁচিয়ে তুলতে হবে আর একটি জীবন। চিরদিন আমি লক্ষ্মী মেয়ে বনানী হয়ে ঘরে থাকব না।'

আমরা পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলাম। আমাদের পাঁচ জোড়া চোখে একটি কথা উঁকি দিয়েছিল। বনানী বলল, বলে শেষ করল শেষ পর্যন্ত।

মাদ্রাজের এক গ্রামে আছে মনোজিৎ। টি বি স্যানাটোরিয়ামে। হাতে যা টাকা ছিল, দু মাসে পাঠিয়ে শেষ করেছে বনানী। এবার তার চাকরি না করলে হচ্ছে না।

'সব এক দিকে, আর এক দিকে ও।' বলে বুঝি কোন্ এক মাদ্রাজ-পল্লীর দিক্-নির্দেশ ক'রে বনানী শূন্যে আঙুল তুলে ধরল। ফুলের কলির মত ওর আঙুলের নিটোল পাতলা সুন্দর ছোট ছায়াটি পড়ল অন্য দিকের দেওয়ালে। আমরা চোখ ফেরাতে পারি নি কতক্ষণ।

'দরকার হলে আমি আর একটা কাজ নেব, স্কুলের ছুটির পর। হাওড়া এখান থেকে বেশী দূর নয়।' বনানী মাথা নাড়ল।

'এই টাকায় মনোজিৎবাবুর কুলোবে না কি?' কে একজন প্রশ্ন করলাম সহানুভূতির সুরে।

'তাই আমি ভাবছি।' আবিষ্টের মত দেওয়ালের দিকে চোখ রেখে বনানী স্থির হয়ে দাঁড়াল। 'একবার যখন বাইরে এসেছি, টাকা আমি রোজগার করতে পারবই।' যেন আপন মনে বলল ও, 'শহরের মেয়ে। পথঘাট জানা আছে।'

আমাদের বুকের ভিতর হুহু করছিল।

যখন ও ঘাড় ফেরাল, দেখলাম, দুই চোখ চকচক করছে জলে।

'মনোজিৎ গরিব। চিরকালই তো গরিব ও! গরিব হওয়া কি অপরাধ, বোন?' বনানী আমাদের প্রশ্ন করল।

উত্তর দিতে গিয়ে আমাদের গলা আটকে গেল। চুপ ক'রে রইলাম সব।

'ও গল্‌ফ খেলে না, স্যুট পরে না, পাইপ টানতে জানে না।' কাঁদতে গিয়েও বনানী কেমন অদ্ভুতভাবে হাসল। 'অপরাধ বইকি! গরিব হওয়া আমাদের সমাজে অপরাধ। শহরের মসৃণ সুন্দর ঝকঝকে সমাজ তো দেখ নি তোমরা!'

সেই সমাজের অস্পষ্ট ধূসর একটা ছবি চোখের সামনে নিয়ে মফস্বলের পাঁচটি মেয়ে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ ক'রে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। অবাক হয়ে।

দেওয়ালের দিকে চেয়ে বনানী চুপ ক'রে ছিল।

বৃষ্টি হচ্ছিল টিপ্‌টিপ্। আষাঢ়ের বৃষ্টি। বেড়ার টিনের গায়ে শব্দ হচ্ছিল অল্প-অল্প।

একটা বেজে গেছে তখন বনানীর হাতঘড়িতে। অদ্ভুত নিশুতি রাত।

না, ভুলে ছিলাম ওটা শিক্ষয়িত্রী-নিবাস, ভুলে গেলাম কিসের রাত।

দেখছিলাম, প্রেমের ধূপকাঠি হয়ে একটি মেয়ে পুড়ছে, নিঃশেষে জ্বলছে। আমরা, আমরা অপ্রেমের দীর্ঘ শুকনো পথ অতিক্রম ক'রে অনেক দিন পর বুক ভরে সেই ধূপের ঘ্রাণ নিলাম।

বনানী কাঁদল অনেকক্ষণ।

তারপর হাসল। চোখ মুছে বাক্স খুলে ফটো বার ক'রে দেখাল। সুঠাম বাহু, বিস্ফারিত বক্ষ। নিশ্বাস বন্ধ ক'রে আমরা মনোজিৎকে দেখলাম। এমন সুস্থ সুন্দর দেহে যক্ষ্মার কীট বাসা বেঁধেছে, আমরা ভাবতেও পারি নি। বনানী বলল, 'আরও সুন্দর ছিল, যখন বি এ ক্লাসে প্রথম ভরতি হয়। এক বছর পড়া বন্ধ ছিল টাকার অভাবে। ট্যুইশনি ক'রে খরচ চালাত নিজের।'

'তারপর?' উৎকর্ণ হয়ে ছিলাম সব।

'আমার একটা আংটি বিক্রি ক'রে একবার ওর পরীক্ষার ফিজ চালিয়েছিলাম, মনে আছে।'

'চালাবেই তো! ও যে বড্ড গরিব!' বনানীর হাতে-ধরা ফটোর দিকে আমরা করুণ চোখে তাকালাম।

'ওর গায়ের ওই শার্টটা লুকিয়ে তৈরি ক'রে দিয়েছিলাম আমি গেল আশ্বিনে, আমাদের দরজী দিয়ে।'

সুন্দর। বনানীর দিকে চেয়ে বললাম, 'চমৎকার মানিয়েছে। তুমি ওকে কি বলে ডাকতে? মন?'

বনানী মাথা নাড়ল। 'আর আমায় ও ডাকত বন।'

একটু থেমে বনানী বলল, 'নতুন সরকারী চাকরি পেয়ে মনোজিৎ গত

জানুয়ারিতে দিল্লি চলে যায়। পরীক্ষায় খুব ভাল ফল করেছিল কিনা, তাই এমন ভাল চাকরিটা সহজে পেয়ে গেছল।'

'চাকরি হয়তো থাকবে। মনোজিৎবাবু শিগগির সেরে উঠবেন।' আশ্বাস দিলাম সবাই। বনানীর জন্যে ভারি কষ্ট লাগল। অস্পষ্ট আশায় অল্প হাসি ঠোঁটে নিয়ে একদৃষ্টে ফটোর দিকে চেয়ে থেকে বলল ও, 'হ্যাঁ, যদি ও চট ক'রে সেরে ওঠে—কিন্তু সে যে অনেক কঠিন!'

স্তব্ধ ঘরে 'কঠিন' কথাটা কঠিনতর হয়ে বেজেছিল কানে।

হাত থেকে ফটোটা নামিয়ে বনানী একসময়ে নিজের মধ্যে ফিরে এল।

'এই শ্রাবণে আমাদের বিয়ে হত। আসছে শ্রাবণে।'

'নিশ্চয়ই হবে! কেন হবে না!' সমস্বরে বললাম সবাই।

'না—না।' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বনানী অন্য দিকে চোখ ফেরাল। 'তার চেয়ে তোমরা বল, বিয়ে আমাদের হয়ে গেছে। অনেক দিন আগে আমি ওর হয়ে গেছি।'

আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ইচ্ছা হচ্ছিল—বনানীকে একবার মনে করিয়ে দিই, তুমি এখানকার হেড মিস্‌ট্রেস; মনে করিয়ে দিই, তুমি হেড মিস্‌ট্রেস নও। অন্ধকারে মনোজিতের ছবির উপর উপুড় হয়ে পড়ে শব্দ ক'রে বারবার ও চুমো খাচ্ছিল। এত উত্তাপ, এমন উদ্বেলতা, অস্থিরতা শহরের মেয়েদের চুমোতে, শুয়ে শুয়ে অনেক রাত অবধি ভাবলাম। কেউ কোনও কথা বলি নি আর।

পরদিন রবিবার। সকালের ডাকে বনানীর চিঠি এল। সবুজ সুন্দর খাম

আষাঢ়ের রৌদ্র-ওঠা সবুজ সকালের মত খামের রং দেখে সকলের চোখ জুড়িয়ে গেল। স্ট্যাম্পের কালিমাখা হলদে বিবর্ণ পোস্টকার্ড দেখেছি শুধু আমরা এতকাল।

দেখলাম, আরক্ত হয়ে উঠেছে বনানীর কান, গাল। কাঁপছে ও, কি ভীষণ কাঁপছিল ওর আঙুলগুলো, টেনে টেনে যখন খামটা ছিঁড়ল।

রানীর মত হাত বাড়িয়ে বনানী পিওনের হাত থেকে চিঠি তুলে নিয়েছিল। পড়া যখন শেষ হল, ওর সেই দৃপ্ত ভঙ্গি আর নেই।

হাত থেকে চিঠি মাটিতে পড়ে গেছল। নুয়ে সেটা তুলে নিয়ে বনানী আবার পড়ল। আর একবার দেখলাম, ওর কুঞ্চিত ভুরুতে, স্ফুরিত নাসারন্ধ্রে

বিশ্বের ঘৃণা উঁকি দিয়েছে। কতক্ষণের জন্তে। টুক্‌রো টুক্‌রো ক'রে চিঠি ছিঁড়ে আকাশের গায়ে ছড়িয়ে দিয়ে বনানী কেমন স্বাভাবিক হয়ে গেল।

কি সেই চিঠি, কেমন তার ভাষা, বুঝতে পারি নি; অবাক হয়ে আমরা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। পরে আস্তে, ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'মনোজিৎবাবুর চিঠি ?'

হাল্‌কা গলায় বনানী হেসে উঠল। 'হ্যাঁ—কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, আমি বেঁচে গেছি, বোন—বাঁচলাম। পেঁপেঘণ্ট খেয়ে কষ্ট ক'রে আর আমায় চাকরি করতে হবে না!'

'মনোজিৎবাবু কি—' প্রশ্ন করতে গিয়ে মাঝপথে আটকে গেলাম সব।

কোলের বেণী পিঠের উপর ছুড়ে দিয়ে বলল, 'বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসে চাকরি করি, ইচ্ছা নেই ওর।'

'তিনি তা চাইবেনই বা কেন!' আশ্বস্ত হয়ে কলস্বরে বললাম আমরা, 'তোমার কষ্ট হবে, শরীর খারাপ হবে ভেবে—'

'ঘুম হয় না ওর।' মুখের কথা কেড়ে নিয়ে ঠোঁট বাঁকা ক'রে বনানী অদ্ভুত মুখভঙ্গি করল। 'শরীর খারাপ নয়, নষ্ট হয়ে যাব, নষ্ট ক'রে ফেলব নিজেকে সবার চোখের বাইরে এসে, এই ওর ভয়।' বনানী কাঁপছিল। একটু থেমে অন্য দিকে মুখ ক'রে আস্তে আস্তে ও বলল, 'গরিব, এত গরিব ওর মন, আমি কি জানতাম!' কথার শেষে ও চোখ মুছল।

চা খাওয়া শেষ ক'রে বনানী বাক্স-বিছানা গুছিয়ে নিলে। চুল বাঁধল, কাপড় পরল, আর সুন্দর ঠোঁটে, যেন অনেকদিন পর, পুরু ক'রে রং মাখল। তারপর শিস দিতে দিতে সামনে এসে বলল, 'তোমরা কি খারাপ, বোন—বাইরে চাকরি করতে এসে সবাই নষ্ট হয়ে গেছ?'

কিছু বললাম না।

কুলির মাথায় মোট চাপিয়ে দিয়ে বনানী শেষবারের মত আমাদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল, 'বাবা আমায় রোজ বলতেন, সাধারণ মধ্যবিত্ত একটা ছেলের মধ্যে এমন কোনও প্রতিভা তুমি খুঁজে পাবে না, বনানী। অনুতাপ ক'রে একদিন তোমায় ফিরতেই হবে! চললুম, ভাই।' দ্রুত ক্ষিপ্র পায়ে ও নিচের মাঠে নেমে গেল।

আমরা হাত-ধরাধরি ক'রে পাঁচজন দাঁড়িয়ে ছিলাম বারান্দায়। যেন কতকাল পর, কত দিন বাদে এখানে, মাঠের এই টালির ঘরে একটি পাখি উড়ে এসেছিল—একটি প্রাণ।